বিদ্রোহী বাংলা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়

সরস্বতী লাইব্রেরী
৯ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য দশ আনা

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ সাহা,
সরস্বতী লাইব্রেরী।
৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মে, ১৯৩১ সাল।

প্রিণ্টার—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত; শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড,
১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপহার

শ্রী

উৎসর্গ

—মাতৃচরণে—

বিজয়ী বাংলা

এক

সে যুগের কথা আজ আর কারো মনে নাই।

হাজার বছর আগের কথা। তখন কোথায় ছিলেন ইংরেজ, কোথায় ছিলেন মুসলমান—সে যুগের বাংলার লোকের কথা আজ আর কেহ বলে না—আজ আর কেহ শোনে না। সবাই গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেয়। সে সময়ের কথা তোমরা যে ইতিহাস পড়, তার পাতায় লেখা হয় নাই।

বিজয়ী বাংলা

হাজার বছর আগে বাঙ্গালী জাতি যে একটা বড় জাতি ছিল, তার প্রমাণ আছে। সেই সুদূর অতীতে যে এই বাংলামায়ের কোলের ছেলেরা বীরবিক্রমে তরোয়াল ঘুরাইয়া দেশ জয় করিতেন, তার নিদর্শন ধীরে ধীরে পাওয়া যাইতেছে। আমাদের এ সব কথা বানানো নয়,—তৈরী গল্প নয়, তোমরা যখন বড় হইবে, যখন বড় বড় সংস্কৃত বই পড়িতে পারিবে, তখন দেখিবে বাঙ্গালীর তৎকালীন মহাশত্রুরা পর্য্যন্ত মুক্ত কণ্ঠে বাঙ্গালীর জয়গান করিয়াছেন। তখন বাঙ্গালীর স্বাধীন রাজা ছিলেন, বাঙ্গালীর রাজ্য ছিল—বাঙ্গালীর দেহে শক্তি ছিল, মনে উদার ভাব ছিল—সে ছিল এক অপূর্ব্ব জাতি।

তোমরা ভাবিবে আমরা মিথ্যা বলিতেছি। আজ আমরা এই কঙ্কালসার দেহখানি লইয়া দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া বেড়াই, আজ পৃথিবীর সবাই নাকি বলে বাঙ্গালী ভীরু, কাপুরুষ—সেই পরের কথা শুনিয়া শুনিয়া, পরের লেখা বইয়ে

দেশের অপমানের কথা, দুর্ব্বলতার কথা পড়িয়া পড়িয়া, পরের আঁকা ছবিতে নিজের শীর্ণ আকৃতি দেখিয়া দেখিয়া তোমাদের মনে আজ আর বিশ্বাস হইতেছে না যে, বাঙ্গালী কখনো স্বাধীন ছিল, কখনো সে দেশে বিদেশে দিগ্বিজয় করিয়া ফিরিত। বাংলার লোকদের দোষ এই ছিল যে, তারা ইতিহাস লেখে নাই—নিজেদের কীর্ত্তি-গাঁথা সঙ্গে লইয়াই তাহারা চির বিদায় লইয়াছে, —তাই জগতের বুকের উপরে তাদের আর কোন দাগ নাই।

হাজার বছর আগে ভারতের অবস্থা ছিল অন্য রকমের। ইতিহাসে তোমরা হর্ষবর্দ্ধনের নাম পড়িয়াছ। হর্ষবর্দ্ধন মহা পরাক্রমে সমগ্র ভারতে একাধিপত্য করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া গেল। সমগ্র উত্তর ভারতের এক-চ্ছত্র আধিপত্য লইয়া চারিদিকে মারামারি কাটা-কাটি চলিতে লাগিল। ইহাকে বলে মাৎস্যন্যায়।

এই মাৎস্যন্যায়ের মধ্যে এক দিকে বাংলা দেশ, অন্য দিকে কাশ্মীর আপনার স্বাধীনতা বরাবর বজায় রাখিয়া ছিল। মধ্য ভারতের যশোধর্ম্ম হর্ষবর্দ্ধনের পরিত্যক্ত সিংহাসন দখল করিয়া ভারতের সম্রাট্ হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাংলা দেশ তখনও স্বাধীন।

আজ যেখানে গৌড়—আগে তাহারই নাম ছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। হাজার বছর আগে বাংলা দেশের রাজধানী ছিল এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে।

ছবির মত পাথরের তৈরী রাজপ্রাসাদ। স্বচ্ছ হ্রদের তীরে, তার বড় বড় থামওয়ালা খিলান-গুলিতে রৌদ্রের আভা পড়িয়া তক্‌তক্ করিত, জ্যোৎস্নার আলোকে প্রাসাদের চত্বরে আলো ছায়া লুকোচুরি খেলিত। হ্রদের জলের ঢেউগুলি হাসিয়া হাসিয়া প্রাসাদের গায়ে লুটোপুটি খাইয়া পড়িত।

সন্ধ্যা নামিয়া আসিতেছে। সুদীর্ঘ সোপান বাহিয়া যুবরাজ অনন্তবর্ম্মা ধীরে ধীরে নীচে

আসিলেন,—সূর্য্যের শেষ আলো যুবরাজের উষ্ণীষে পড়িয়া ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। যুবরাজ একবার প্রাসাদের উপরে চাহিলেন। তীরে নৌকা বাঁধা ছিল—তাহাতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। কহিলেন,—"রাঘব, আমার বর্ম্ম আনিয়াছ?"

রাঘব নৌকার মাঝি—অসম সাহস তার—যুবরাজের বর্ম্ম আনিয়া দিল, কহিল—"যুবরাজ, কাজ বড় ভাল হইতেছে না। মহারাজকে না জানাইয়া—"

যুবরাজ অনন্তবর্ম্মা কহিলেন,—"চুপ্ কর ভীরু! তোমার সাহস না থাকে ফিরিয়া যাইয়া ঘরের কোণে বসিয়া থাক।"

রাঘব অনেক দিনের পুরাতন মাঝি,—যুবরাজের পায়ের ধূলা লইয়া কহিল,—"মরিতে হয় তোমার সাথে মরিব ভাই, তবু ফিরিয়া যাইব না।"

নৌকা চলিতে লাগিল,—হ্রদের অপর তীরে

ভীষণ অরণ্য—অরণ্যের পরে পর্ব্বত। রাঘব ক্ষিপ্রহস্তে দাঁড় বাহিয়া সেই পর্ব্বতের দিকে চলিতে লাগিল।……ধীরে ধীরে অন্ধকার আরো গাঢ় হইয়া আসিতে লাগিল।

যুবরাজ প্রাসাদের দিকে শেষবার চাহিয়া দেখিলেন—ঘরে ঘরে দীপ জ্বলিয়া উঠিতেছে।

রাজ্য মধ্যে গুজব উঠিয়াছে খণ্ডস্থান অরণ্যে এক সিংহ আসিয়াছে। তার অত্যাচারে প্রজারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। আজ এখানে, কাল সেখানে, এই রকম করিয়া প্রজার প্রাণ নাশ করিয়া সিংহ নির্ভয়ে ঘুরিয়া বেড়ায়। রাজার কাছে প্রজারা আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল,—"মহারাজ, আমাদের ধনমান রক্ষা করুন।" মহারাজ আদিত্যবর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সিংহ এখন কোথায় আছে বলিতে পার?" চক্রদত্ত কহিল, "আজ দ্বিপ্রহরে এই আদিত্যসাগর হ্রদের তীরে অরণ্যের মধ্য হইতে গর্জ্জন শোনা গিয়াছে।"

মহারাজ কহিলেন—"সিংহের অত্যাচার ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিতেছে,—আমি বাছা বাছা সেনাপতিকে সিংহ হত্যা করিবার জন্য পাঠাইলাম, কেহ আর ফিরিল না! বাংলায় কি এমন বীর নাই যে, এই আপদ দূর করিতে পারে?"

এমন সময়ে যুবরাজ অনন্তবর্ম্মা মহারাজের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আদিত্যবর্ম্মার এই কথা শুনিয়া যুবরাজ আবার তেমনি নিঃশব্দে ফিরিয়া গেলেন। যুবরাজকে কেহ লক্ষ্য করিল না।

প্রজাবর্গকে আশ্বাস দিয়া মহারাজ আদিত্য-বর্ম্মা সৈন্যদের কুচ্ কাওয়াজ দেখিতে চলিয়া গেলেন। ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল—সন্ধ্যার নহবত বাজিয়া উঠিল। রাজার যেন কিছুই ভাল লাগে না, অত মিষ্টি নহবত বড় কর্কশ বোধ হইল। রাজা প্রাসাদে ফিরিলেন।

রাত্রি হইয়া আসিয়াছে,—পঞ্চমীর ম্লান

জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। অল্প আলোতে হ্রদের তীরের পাহাড়গুলি বড় ভীষণ দেখাইতেছিল। মহারাজ আদিত্যবর্ম্মা প্রাসাদের উপরে চত্বরে দাঁড়াইয়া সেই ভীষণ শোভা দেখিতে লাগিলেন। দূরে মন্দিরে মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, অদূরে রাজপ্রাসাদে রাজবন্দীরা নিশাবন্দনা গান করিতে লাগিল। রাজা আজ আর মন্দিরে গেলেন না,—রাজবন্দীর গান আর শুনিলেন না। কি এক অজানা দুঃশ্চিন্তায় তাঁর মন ভরিয়া উঠিল।

ফুট্‌ফুটে একটি মেয়ে—রাজার আদরের রাজকন্যা কল্যাণী আসিয়া রাজার হাত ধরিয়া কহিল, —"বাবা, চল মন্দিরে যাই!" রাজা কি ভাবিতেছিলেন, চমকিয়া উঠিলেন; ফিরিয়া কহিলেন, —"চল।" হ্রদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রাজা চলিলেন। হঠাৎ বনভূমি রাজপ্রাসাদ কম্পিত করিয়া একটা ভীষণ গর্জ্জন শোনা গেল। রাজা আবার পিছন ফিরিলেন, কল্যাণী কহিল,—

"বাবা, ঐ বুঝি সিংহের গর্জ্জন! আমায় সিংহ দেখাবে, বাবা?

মহারাজের মুখ হইতে কথা বাহির হইল না। তিনি মেয়ের হাত ধরিয়া দৃঢ় পদক্ষেপে মন্দিরের দিকে চলিলেন।

———

দুই

সারা রাত্রি গিয়াছে, রাজকুমার অনন্তবর্ম্মা প্রাসাদে ফিরেন নাই। মহারাণী পদ্মাদেবী সকল জায়গায় খোঁজ করিয়াছেন, কিন্তু যুবরাজের সন্ধান নাই। গভীর রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়াছিল—ঝম্ ঝম্ ঝম্। রাণীর চিন্তার আব অন্ত নাই—ভাবনার আর শেষ নাই!

প্রভাত হইল! মহারাজ আদিত্যবর্ম্মা মন্ত্রী শুভঙ্করের সহিত কথা কহিতেছিলেন, ধীরে ধীরে রাঘব আসিয়া দাঁড়াইল। রাঘবের সারা

অঙ্গ দিয়া রক্ত ঝরিতেছে,—হাতে তার অনন্তবর্ম্মার উষ্ণীষ, অন্য হাতে অনন্তবর্ম্মার তরোয়াল। রাজা দেখিয়া চম্‌কাইয়া উঠিলেন,—একি! রাঘবের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

মন্ত্রী শুভঙ্কর কহিলেন—"রাঘব, যুবরাজ কোথায়?" রাঘব কাঁদিতে লাগিল,—কহিল, "মহারাজ, তোমার পুত্র তোমার তরবারির অপমান করে নাই, সিংহ মারিবার জন্য বীরের মত তিনি প্রাণ দিয়াছেন।"

মহারাজ আদিত্যবর্ম্মা কোন কথা কহিলেন না,—নীরবে তাঁর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। রাঘব রাজার পদতলে যুবরাজের উষ্ণীষ ও তরবারি রাখিয়া দিল।

রাঘব কহিল,—"হ্রদের তীরে সিংহ আসিয়াছে জানিতে পারিয়া কাল সন্ধ্যায় যুবরাজ সেইখানে যান। প্রথমে সেই সিংহ আমায় আক্রমণ করে। আমাকে রক্ষা করিতে যাইয়া যুবরাজ প্রাণ দিলেন।... ..

মহারাজ আদিত্যবর্ম্মা যুবরাজের উষ্ণীষ তুলিয়া লইলেন—কহিলেন, "বীরপুত্র আমার, আমার মান রাখিতে তুমি আজ প্রাণ দিলে !"

রাজ্য মধ্যে প্রচার হইয়া গেল, সিংহের হাতে যুবরাজ অনন্তবর্ম্মা প্রাণ দিয়াছেন। আর রক্ষা নাই, পালা পালা—প্রজারা যে যেদিকে পারিল —জিনিষপত্তর বাঁধিয়া সরিয়া পড়িতে লাগিল। কেহ কর্ণসুবর্ণে গেল, কেহ গেল কলিঙ্গে। এমন অরাজক দেশে আর কে থাকে বাবা !

গভীর রাত্রি। সুপ্ত রাজধানী। ম্লান জ্যোৎস্না ডুবিয়া যাইতেছে ! পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজপথে এক তরুণ যুবা চলিয়াছে। মুখে তার অপূর্ব্ব দীপ্তি, হাতে শাণিত কৃপাণ ! বুক উঁচু করিয়া চলিয়াছে সে !—মাথায় তার সবুজ রংয়ের পাগ্, পাগের চুম্‌কিতে ম্লান জ্যোৎস্না চিক্‌মিক্ করিতেছে।

রাজপথ জনশূন্য—এত রাত্রে কে এ যুবা রাজপথ বাহিয়া চলে ? নির্ভীক্ তার দৃষ্টি ! জান্‌লা

খুলিয়া এক বুড়া কাশিতে কাশিতে দেখিল পথ দিয়া এক ছোকরা চলিয়াছে। বুড়া মনে মনে কহিতে লাগিল "যাও বাবা,—এত রাত্রে সিংহের মুখে যাও। আজকালের ছেলেদের সাহস দেখ না।" সভয়ে বৃদ্ধ জানালা বন্ধ করিয়া আবার কাশিতে লাগিল।

তরুণ যুবক তেমনি পথ চলিতে লাগিল।

ভোর হইয়াছে—ঐ যেখানে প্রতি বছর ফাগুনের দোল উৎসবে নাচ গান হয়, ঐ দোলমঞ্চের চারিদিকে আজ লোকজনের বড় ভিড়। ক্রমাগত লোকজন ঐ দিকেই ছুটিতেছে। সিংহ মারা গিয়াছে!

"সিংহ মারিল কে?"

ভিড়ের মধ্য হইতে বিক্রমমাণিক্য বলিয়া উঠিল—"হেঁ হেঁ বাবা,—একি যার তার কর্ম্ম,—এই মাণিক্য না থাকিলে তোমরা সবাই মরিতে এই সিংহের হাতে।"

বিরুপাক্ষ সিংহের মুখখানা দেখিতেছিল,

কহিল 'এ সিংহ আমি মেরেছি হে। ওর কথা বাদ দাও,—ওর কোন পুরুষে তরোয়াল ধরেছিল ?"

মাধববর্ম্মা কহিল—"তোমাদের সাধ্য কি এই এত বড় সিংহকে মার্‌তে পার ? এ জন্তু আমিই মেরেছি।"

পথ দিয়া নগরপাল যাইতেছিলেন—গোলমাল ও ভিড় দেখিয়া আসিয়া কহিলেন, "তোমরা তিনজনেই যখন সিংহ মারিয়াছ,—চল রাজার কাছে, পুরস্কার পাইবে।"

মহারাজা আদিত্যবর্ম্মার কাছে খবর গেল, তিনি রাজকন্যা কল্যাণীর হাত ধরিয়া রাজসভায় আসিলেন। রাজার মুখে আর হাসি নাই,—মনে আর আনন্দ নাই,—তিনি বিরষ মুখে আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন। ততক্ষণে রাজসভা লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে, সভায় রাজ্যের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। রাজার হইয়া রাজপুত্র অরুণবর্ম্মা কহিলেন—"আজ যে সিংহ নিহত

হইয়াছে—মহারাজ জানিতে চান, কে উহাকে হত্যা করিল।”

সভাতল নিস্তব্ধ, কেহ কথা কহে না। নগর পাল আগাইয়া আসিলেন,—কহিলেন “ইহার নাম বিক্রমমাণিক্য, ইনি বিরুপাক্ষ, আর ইনি মাধববর্ম্মা, ইহারা নাকি সিংহকে হত্যা করিয়াছেন —এইরূপ বলিতেছেন।”

অরুণবর্ম্মা কহিলেন—“ইহারা যে সিংহকে হত্যা করিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ আছে ?”

প্রমাণ ? সে আবার কি ? প্রমাণ ত নাই ! মহারাজা বিরক্ত হইলেন।—এমন সময়ে সভার এক দিকে গোলমাল শোনা গেল। একটি তরুণ যুবা ভিতরে আসিতে চাহিতেছেন, প্রহরীরা তাহাকে বাধা দিতেছে। কুমার অরুণবর্ম্মা কহিলেন—“তুমি কি চাও, যুবক ?”

তরুণ যুবা হাসিলেন, কহিলেন, “সিংহ হত্যার প্রমাণ চাহিতেছিলেন ? এই দেখুন প্রমাণ

আমার হাতে”। যুবক সিংহের জিহ্বা বাহির করিয়া দেখাইলেন।

মহারাজ আদিত্যবর্ম্মার মুখে হাসি ফুটিল,—তিনি পুত্রশোক ভুলিয়া গেলেন। আগাইয়া আসিয়া সেই যুবকের গলায় নিজের মুক্তামালা পরাইয়া দিলেন। কহিলেন—“যুবক, তুমি কি পুরস্কার চাও?”

মাথা নত করিয়া কহিলেন—“আর কিছু চাহি না মহারাজ। তোমার সৈন্যদলে থাকিয়া দেশের সেবা করিতে চাই।

মহারাজ আদিত্যবর্ম্মা খুসী হইলেন, নিজের তরবারিখানা খুলিয়া জয়ন্তের হাতে দিলেন,—জয়ন্ত মহারাজকে প্রণাম করিলেন। জয়ন্ত মাথা উঠাইয়া দেখিলেন,—রাজার মেয়ে কল্যাণী তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

তিন

প্রকাণ্ড কাশ্মীর রাজ্য—কিন্তু রাজ্যে শান্তি নাই। প্রজার চোখের জলে দেশ ভাসিয়া গেল। রাজা উদয়াদিত্য নিজের সুখ লইয়াই ব্যস্ত রহিলেন।

এমন সুন্দর রাজ্য কাশ্মীর,—তার ছোটবড় হাজারো পাহাড়ে তুষারের শয্যা বিছানো থাকে,—বন উপবনে ঘেরা, ছোট ছোট নদী তাদের ঘিরিয়া ফিরিয়া, তাদের গায়ে চুমা খাইয়া নামিয়া গিয়াছে। লোকে বলে, কাশ্মীর দেশ ভারতের সেরা দেশ।

সেখানকার লোকেরাও খুব সুন্দর! কিন্তু রাজা উদয়াদিত্য নিজে বড় ভাল লোক ছিলেন না। নিজের সুখ-সুবিধা হইলে তাঁর

আর কোন চিন্তা ছিল না। তিনি মনে করিতেন, পৃথিবীতে রাজা উদয়াদিত্য সকলের চেয়ে বড়। তাঁর স্পর্দ্ধাই তাঁহার কাল হইল।

উদয়াদিত্যের বড় ভাই ছিলেন বজ্রাদিত্য। তিনি ছিলেন খুব ধার্ম্মিক আর বীর। তাঁর সময়ে কাশ্মীর রাজ্যের খুব উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু বড ভাই রাজত্ব করেন, ইহা উদয়াদিত্যের ভাল লাগিল না,—উদয়াদিত্য নানা সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে একজন গুপ্ত ঘাতকের অস্ত্রের আঘাতে উদয়াদিত্য বড় ভাইকে হত্যা করাইয়া নিজে রাজা হইলেন।

বড় ভাইয়ের রক্তে যে সিংহাসন উদয়াদিত্য পাইলেন, তাহাতে তিনি বেশী দিন বসিয়া রাজত্ব করিতে পারিলেন না। উদয়াদিত্য নিজেকে ভগবানের সহিত তুলনা করিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না; তার কারণ, ব্রাহ্মণেরা ভগবানের মহিমা প্রচার করিতেন। একদিন একজন ব্রাহ্মণ

ভগবানের স্তুতিগান করিতেছিলেন,—উদয়াদিত্য সেই পথে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণের মুখে ভগবানের স্তুতিগান উদয়াদিত্যের অসহ্য বোধ হইল। তিনি কোতোয়ালকে ডাকিয়া ব্রাহ্মণকে বেত্র প্রহার করিয়া রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

ব্রাহ্মণ এই অপমান ভুলিলেন না। তাঁহার বুকে হিংসার আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। একদিন রাজা উদয়াদিত্য রাজপথ দিয়া যাইতেছিলেন,—ব্রাহ্মণ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া রাজার বুকে ছুরী বসাইয়া দিলেন। রাজা উদয়াদিত্য শেষ নিঃশ্বাস লইলেন।

রাজা উদয়াদিত্যের ছোট ভাই ছিলেন ললিতাদিত্য। প্রজারা রাজার মৃত্যুর পর ললিতাদিত্যকে কাশ্মীরের সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন।

সিংহাসনে বসিয়া রাজা ললিতাদিত্য প্রজার হিতে মন দিলেন। দেবদ্বিজে তাঁর ভক্তি ছিল,—

তিনি নানাস্থানে দেবমন্দির গড়িলেন; মন্দিরে মন্দিরে সকাল-সন্ধ্যায় নানা উপচারে দেবতার পূজা হইতে লাগিল। রাজা ব্রাহ্মণদের ডাকিয়া জমি দিলেন, ধেনু দিলেন, গরীব প্রজার শীতের কাপড় দিলেন। সকলে দুই হাতে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিল। প্রজার জন্য পাহাড় কাটিয়া পথ হইল। যার ঘর নাই, রাজা শালগাছ কাটিয়া তার ঘর গড়াইয়া দিলেন। লোকে কহিল, "রামচন্দ্রের পর এমন রাজা আর হয় নাই।" কথিত আছে, রাজা ললিতাদিত্য মরুভূমিতে এক নগর বসাইয়া শ্রান্ত পিপাসিতের জন্য জলপানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ললিতাদিত্যের অনাথ আশ্রমে নিত্য লক্ষ লোকের পাতা পড়িত।

রাজা ললিতাদিত্য প্রজার জন্য খরচ করিলেন খুব, কিন্তু নিজের খরচ সেই হিসাবে কমাইয়া দিলেন। রাজা উদয়াদিত্যের ছিল ১৮ জন মন্ত্রী; তাঁরা মোটা মাহিনা পাইয়া কুমন্ত্রণায় রাজাকে নাচাইয়া রাখিত। রাজা হইয়া ললিতাদিত্য

তাদের সকলকে দূর করিয়া একজন মাত্র মন্ত্রী বহাল রাখিলেন।

ললিতাদিত্য ছিলেন পরম ধার্ম্মিক,—নারায়ণের প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি। তাই তিনি 'কেশবের' নামে 'পরিহাস কেশব' বিগ্রহ স্থাপনা করিলেন। কত দেশ হইতে কারিগর আসিল, মিস্ত্রী আসিল; বারাণসী হইতে শিল্পী আসিল দশ গণ্ডা। তাহারা দিনরাত খাটিয়া রাজধানীর নিকটে পরিহাসপুরে পাথর কাটিয়া চৌকস করিল, তারপর বড় বড় ভারি পাথরের উপর পাথর সাজাইয়া এমন মন্দির গড়িয়া তুলিল—যার চূড়া উঠিয়া আকাশের গায়ে লাগিল। মন্দিরের কারু-কার্য্য শেষ করিতে তাদের বছর কাটিল। তারপর মন্দিরের মধ্যে তারা যখন সোণার কেশবের সোণার মূর্ত্তিখানি স্থাপনা করিল, তখন ললিতা-দিত্যের মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল। তিনি গলায় বস্ত্র জড়াইয়া দেবতাকে প্রণাম করিলেন। রাজা স্বপ্ন দেখিলেন, '—যতদিন পরিহাসকেশবের মূর্ত্তি

অবিকৃত থাকিবে, ততদিন ললিতাদিত্যকে কেহ পরাজয় করিতে পারিবে না।'

আনন্দে ললিতাদিত্য রাজ্যের সকল প্রজাদের পরিতোষ করিয়া আহার করাইলেন। সকলে রাজার জয় গাহিল।

পরিহাস কেশবের মন্দিরের আশেপাশে আরও ছোটবড় বহু মন্দির মাথা খাঁড়া করিয়া দাঁড়াইল। দেশ বিদেশ হইতে বহু লোক আসিয়া কাশ্মীরের সেই অপূর্ব্ব শোভার মধ্যে অপরূপ মন্দির দেখিয়া কহিতে লাগিল—"হাঁ, কারিগরের হাত বটে!"

পরিহাস কেশবের মন্দিরের পাশে যে মন্দির উঠিল তাহা 'রামস্বামীর' মন্দির। দাক্ষিণাত্য হইতে কালো পাথর আনিয়া ললিতাদিত্য রামস্বামী দেবতার বিগ্রহ স্থাপনা করিলেন।

নিজের রাজ্যের সকল ব্যবস্থা করিয়া রাজা ললিতাদিত্য কহিলেন—"আমি দিগ্বিজয়ে বাহির হইব।" রাজা সেনাপতিকে ডাকিলেন, মন্ত্রীকে ডাকিলেন, দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাজা সাত দিন সাত

রাত্রি পরামর্শ করিলেন। তারপর খড়্গ হাতে করিয়া পরিহাস কেশবের মন্দিরে চলিলেন।

সেইখানে যাইয়া রাজা তপস্যায় বসিলেন। তপস্যা আর ভাঙ্গে না, মন্দিরের দ্বার আর খোলে না! দেশ বিদেশের বহু লোক মন্দির দেখিতে আসিয়া ঘুরিয়া যায়। দশ দিন পরে রাজা ললিতাদিত্য হাসিমুখে মন্দির হইতে বাহির হইলেন; সবাইকে ডাকিয়া কহিলেন, "দেবতার আদেশ পাইয়াছি—কাশ্মীরের ললিতাদিত্য ভারতের সম্রাট্ হইবেন।"

দিকে দিকে সৈন্য সাজিল। কাশ্মীরের গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে সম্রাটের আদেশ লইয়া সেনাপতিরা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। যারা সাহসী তারা ঘোড়ায় চড়িয়া বর্ষা হাতে করিয়া রাজধানীতে আসিয়া ললিতাদিত্যের রক্ত-পতাকার নীচে দলে দলে জড় হইতে লাগিল। দেখিয়া দেখিয়া ললিতাদিত্যের বুকখানা আনন্দে ফুলিয়া উঠিল।

চার

জয়ন্তর বাড়ী ছিল কোথায় তা' কেউ জানে না। বাড়ী-ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে জয়ন্তের হাসি হাসি মুখখানা কালিমাখা হইয়া যায়।

কুমার অরুণবর্ম্মা কহিলেন—"জয়ন্ত, সংসারে তোমার কি কেউ নাই?" হাসিয়া জয়ন্ত কহিলেন, "কেন ভাই, তোমরাই ত' আছো! আমার আর ভাবনা কি!"

জয়ন্তের বাড়ী ছিল বাংলার একখানি গ্রামে। তার পিতা বিজয় সেন ছিলেন মহারাজ শশাঙ্ক-

গুপ্তের সেনাপতি। শশাঙ্ক গুপ্ত তাম্রলিপ্তির সমুদ্রতীরে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে বিজয় সেনও প্রভুর পতাকার সম্মান রাখিতে যুদ্ধ হইতে আর ফিরিলেন না। জয়ন্ত তখন এতটুকু ছোট! স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া জয়ন্তের মা কমলাদেবী জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিলেন। আজ এর কাছে কাল ওর কাছে এমনি করিয়া স্রোতের ফুলের মত জয়ন্ত বড় হইতে লাগিল। ছোট হইতে সে কোন দিন সুখের মুখ দেখে নাই, কোন দিন মায়ের আদর, বাপের স্নেহ জানে নাই। জয়ন্তের তাতে কোন দুঃখ নাই,—তেমনি হাসিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, তার মনের ব্যথা কেহ জানে না।

মহারাজ আদিত্যবর্ম্মা আদিত্যসায়রের তীরে মর্ম্মর পাথরের আসনে বসিয়া কর্ণাটের রাজদূতের সহিত কথা কহিতেছিলেন, এমন সময় রাজকন্যা কল্যাণী দেবী সেইখানে ছুটিয়া আসিলেন!—দেখিতে দেখিতে রাজার অদূরে

একটা বাজপক্ষী কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেল; রাজা চমকিয়া উঠিলেন—"এ কি কল্যাণী?"

কল্যাণী হাসিয়া কহিলেন—"বাবা, আমার হাত কেমন সাফ্' হয়েছে দেখেছ?"

মহারাজ বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—কহিলেন, "তুই এই তীরে এই পাখীকে মেরেছিস্ মা?"

কর্ণাট রাজদূত নিজের মনে মনে কহিলেন,—"আশ্চর্য্য!"

কল্যাণীর আনন্দ আর ধরে না।—কহিলেন, "বাবা, আমায় কি পুরস্কার দেবে?"

মহারাজ কহিলেন, "এই তীর চালনা কার কাছে শিখেছিস্ মা?"

এমন সময় জয়ন্তকে সঙ্গে করিয়া কুমার অরুণবর্ম্মা সেইখানে আসিলেন। অরুণ কহিলেন, "মহারাজ, জয়ন্তর কাছে আমরা এই বিদ্যা শিখ্ছি।"

মহারাণী পদ্মাদেবী প্রাসাদের উপর হইতে দেখিতেছিলেন। তাঁর এসব বড় পছন্দ হয় না। তিনি আসিয়া কহিলেন,—"মহারাজ, তোমার রাজ্যে কি পাখী মেরেই সব বড় বড় বীর হবে না কি?"

মহারাজ আদিত্যবর্ম্মা হাসিলেন, কহিলেন,—"রাণি, বীরত্ব প্রকাশ করা পুরুষের শুধু একার নয়। বাংলার মেয়েরা বহু যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না।"

রাণী পদ্মাদেবী মুখ ঘুরাইয়া কহিলেন,—"তোমাদের এসব কথা আমি অতশত বুঝি না। আমি বুঝি,—মেয়ে বড় হবে, বড় হলে বিয়ে হবে, বিয়ের পরে মেয়ে শ্বশুরঘর করবে। তা' না সে কি ঢাল-তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ করতে ছুটবে না কি?"

"প্রয়োজন হ'লে ছুটবে বৈকি, রাণি। জয়ন্ত, তুমি বেশ করেছ; এদের ভাল করে অস্ত্র চালনা শেখাবে। আমি আর এক পক্ষ পরে তার পরীক্ষা নেব।"

মাথা নোয়াইয়া জয়ন্ত হাসিমুখে চলিয়া গেলেন। কল্যাণী মুখ নীচু করিয়া হাসিল।

কুমার অরুণবর্ম্মা কহিলেন,—"বাবা, কামরূপ থেকে দূত এসেছেন,—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভাস্করদেব দূত পাঠিয়েছেন।"

মহারাজ কহিলেন,—"এইখানে তাঁকে নিয়ে এস।"

কুমার চলিয়া গেলেন। কর্ণাট-দূত কহিলেন —"মহারাজ, আমায় বিদায় দিন। আমাদের রাজা শিলাদিত্যের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর একমাত্র কন্যা রাণী রত্নাদেবী আমায় দেশে ফিরে যেতে আহ্বান করেছেন। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের সঙ্গে নাকি তাঁর গোলযোগ আরম্ভ হয়েছে।"

মহারাজ আদিত্যবর্ম্মার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কর্ণাটের দূত বিদায় লইল।

মহারাণী পদ্মাবতী কহিলেন,—"মহারাজ, মেয়ের কি বিয়ে দিতে হবে না?"

বিয়ের কথা উঠিতেই কল্যাণীদেবী দূরে

চলিয়া গেলেন। মহারাজ আদিত্যবর্ম্মা কহিলেন,—"আমার দোষ কি বল! আমি কলিঙ্গের রাজপুত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির কর্‌লাম, কিন্তু তোমার পছন্দ হ'ল না।"

মহারাণী কহিলেন, "কেন, কলিঙ্গের রাজার ছেলের চেয়ে ভাল বর কি আর পৃথিবীতে নাই? কর্ণসুবর্ণের সেই সম্বন্ধটা—"

এমন সময় কামরূপের দূতকে সঙ্গে করিয়া কুমার অরুণবর্ম্মা সেইখানে উপস্থিত হইলেন। কামরূপের রাজা দূত পাঠাইয়াছেন,—দূতের হাতে একখানা রূপার থালা—থালায় একটি নারিকেল, আর একখানা তরোয়াল! দূত রূপার থালা মাটিতে রাখিলেন, রাজাকে গড় হইয়া প্রণাম করিলেন, তারপর মাথার উষ্ণীষ হইতে একখানা সুগন্ধি মাখানো পত্র বাহির করিয়া রাজার হাতে দিলেন। রাজা পড়িলেন,—পড়িয়া কহিলেন, "রাণি, কামরূপরাজ তোমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে চান।"

মহারাণী পদ্মাদেবী কহিলেন—"দেশের শত্রুর হাতে নিজের মেয়েকে তুলিয়া দিবে রাজা? তা' কখন হয় না।"

দূতের মুখখানা কালো হইয়া গেল।

মহারাজ আদিত্যবর্ম্মা কহিলেন, "দূত, তোমার রাজাকে বল, বাংলার রাজা শত্রুর ঘরে মেয়ে দেন না।"

দূত ধীরে ধীরে কহিল—"তবে এই রূপার থালার কি নিবেন মহারাজ? আমার থালার সমস্ত জিনিষ ফিরাইয়া লইয়া যাইবার আদেশ নাই।"

আদিত্যবর্ম্মা কহিলেন,—"বার বার পরাজিত হ'য়েও ভাস্করের অপমান হয় নাই। উত্তম, অরুণ! রূপার থালা হ'তে তরবারি উঠিয়ে লও। দূত, তোমার রাজা ভাস্করদেবকে বলিও, যদি মরিবার সাধ থাকে তবেই যেন সে বাংলার সীমা অতিক্রম করে।"

দূত চলিয়া গেল। রাজা সেই দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তারপরে

কহিলেন,—"অরুণ! জয়ন্তকে এখানে ডাকিয়া আন।"

জয়ন্ত আসিলেন। রাজা কহিলেন—"জয়ন্ত, বাংলার মুখ রাখ্‌তে হইবে। কামরূপের রাজা ভাস্করদেব বাংলার সীমান্ত আক্রমণ কর্চ্ছেন। তুমি লক্ষ সৈন্যের নেতৃত্ব নি'য়ে শত্রুর বিনাশ কর্‌বে। তাঁর স্পর্দ্ধা—সে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজ-কন্যার পাণিগ্রহণ কর্‌তে চায়!"

জয়ন্ত কহিলেন—"আমরা কবে যা'ব মহারাজ?"

মহারাজ কহিলেন—"তোমরা কালই যাত্রা কর্‌বে। আমি তোমাদের পিছনে থাক্‌ব। তোমার সঙ্গে কুমার অরুণবর্ম্মা যা'বেন। এবার সেনাপতি বিশ্বপতির বিশ্রাম। আমি তোমাকেই সেনাপতি নিযুক্ত কর্‌লাম।"

অভিবাদন করিয়া জয়ন্ত চলিয়া যাইতে-ছিলেন—কল্যাণী দেবী কহিলেন, "বাবা, আমিও যুদ্ধে যাব?"

আদিত্যবর্ম্মা কহিলেন—"তা হয় না মা, তুমি ঘরেই থা'কবে!"

কল্যাণী কহিলেন, "আমি ঘরে থাক্‌ব? তোমরা যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে হয়রাণ হ'য়ে পড়্‌বে, তোমাদের বাতাস কর্‌বে কে? যুদ্ধে আহত হ'য়ে পড়্‌লে ক্ষতস্থান বেঁধে দেবে কে? মুখে খাবার কে তুলে দেবে? না আমি যাব।"

অবুঝ মেয়ে গোঁ ধরিয়াছে। রাণী কহিলেন, —"কেমন, শেখাও এবার তীর আর তরোয়ালের খেলা! আরে মেয়েমানুষ লোকে বলে কেন! আয় কল্যাণী, তোর চুল বাঁধা হয় নি!"

না হইল তাতে কি? কল্যাণী নড়িল না।

মহারাজ কহিলেন—"আচ্ছা, তুই যাবি আমার সঙ্গে মা। আমি তোমায় নিয়ে যাব। জয়ন্ত, যাও সৈন্যদের তৈরী কর।"

যুদ্ধের বাজনা বাজিয়া উঠিল—ঝম্‌ঝম্ ঝম্। তালে তালে বাংলার লাখো সেনা জয়ন্তের পতাকার নীচে সমবেত হইতে লাগিল। দিনরাত

কেন ? মেয়েরা বুঝি যুদ্ধে যেতে পারে না ?

বিজয়ী বাংলা

রাজধানীর রাস্তা দিয়া সৈন্য আসে যায়,—কুচ্-কাওয়াজ করে। নদীর তীরে হাজার হাজার বজ্‌রা সাজিল। সেকালের বাঙ্গালী সৈন্য নৌ-যুদ্ধ করিতে ভারি ওস্তাদ্ ছিল। তখন কামান-বন্দুকের রেওয়াজ্ হয় নাই,—বাংলার সৈন্য মালকোচা দিয়া কাপড় আঁটিল, মাথায় হল্‌দে রংএর পাগে জরির ঝালর দুলিতে লাগিল। হাতে ধনুক, পিঠে তূণ, আর কোমরবন্ধে শাণিত তরোয়াল, বাংলার সৈন্যদল গাহিল,—"জয় বাংলা মায়ের জয়!"

হাজার বছর আগে বাংলার সোণার ছেলেরা এমনি করিয়া যুদ্ধ জয় করিতে যাত্রা করিয়াছে। দলে দলে তালে তালে পা ফেলিয়া এমনি করিয়া তারা হাসিমুখে শত্রু দলন করিতে ছুটিয়াছে। দুয়ারে পূর্ণ কলস, হাতে ফুলের মালা, মুখে আশীর্ব্বাদ, আর লাজবর্ষণের মধ্যে এমনি করিয়া তারা বিজয় লক্ষ্মীকে বরণ করিয়া আনিয়াছে,—বাংলার মেয়েরা তাদের বরণ করিয়া

ঘরে তুলিয়াছেন। আজ সে বাংলা নাই,—সেই বাংলার সৈন্যদল নাই,—সেই সোণার বাংলার সোণার অতীত নামটুকু মাত্র আছে! আর সব শ্মশান হইয়া গিয়াছে!

তাই, বাঙ্গালী সে কথা বিশ্বাস করে না।

এমনি করিয়া সাজিয়া, মায়ের জয়গান গাহিয়া জয়ন্তের বাঙ্গালী সৈন্য উত্তর বাংলায় ছুটিয়া চলিল। করতোয়ার স্রোত বাহিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের হাজারো ছিপ হাওয়ার বেগে চলিয়া গেল। মেয়েরা শাঁখ বাজাইলেন, খই ছিটাইয়া উলুধ্বনি দিয়া বিদায় দিলেন।

জয়ন্ত চলিয়া গেলেন,—কিন্তু কল্যাণীর মুখের হাসিটুকু কে যেন চুরি করিয়া লইল। কল্যাণী কথা কয় না, চুল বাঁধে না, খাইতে বসিলে নাড়াচাড়া করিয়া উঠিয়া যায়। রাণী পদ্মাদেবীর চোখ এড়াইল না—মেয়ের ব্যথা যে মা ভাল জানে।

তার পরদিন। রাজা আদিত্যবর্ম্মা ঘুম হইতে উঠিয়াছেন—কল্যাণী আসিয়া কহিল,

"বাবা, আজ যুদ্ধে যাবে ত? আমায় নিতে ভুলো না যেন—"

রাজা মিথ্যা কহিলেন,—"আজ আমার ত যাওয়া হল না, মা। আমাদের সব সৈন্য এখনো এসে পৌঁছায় নি। আমি কাল যাব। তোমায় নিয়ে যাব মা।"

নিশ্চিন্ত মনে কল্যাণী চলিয়া গেল। রাত্রি দ্বিপ্রহর। হঠাৎ কি একটা শব্দে কল্যাণীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পাশে ধাত্রী শুইয়া আছে। কল্যাণী কহিল, "রোহিণী, দেখ্ না বাইরে কিসের গোলমাল।" রোহিণী বুড়া ধাই,—রাজকন্যাকে কোলেপিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। বুড়া বয়সে ঘুম নষ্ট হওয়ায় ধাই চটিয়া কহিল—"কি জানিরে বাপু, তোর তায় অত নিকেশ কেন? তুই ঘুমো।"

কল্যাণী ঘুমাইল না,—ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। রাজপথে সৈন্যদল চলিয়াছে। রাজা আদিত্যবর্ম্মা ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধে চলিয়া-

ছেন! দেখিয়া দেখিয়া কল্যাণীর ভারি দুঃখ হইল। বাবা শেষে আমায় ফাঁকি দিয়াছেন!

কল্যাণী আলো জ্বালিল।—আঁচল জড়াইয়া কোমরে বাঁধিল। তারপরে ঘোড়াশালে যাইয়া বাছিয়া বাছিয়া ভাল ঘোড়ায় চড়িয়া যখন বাহির হইতে গেল,—দেখে রাণী পদ্মাদেবী সম্মুখে।

রাণী কহিলেন,—"একি কল্যাণী?"

"অবাক হইতেছ কেন মা? ঘোড়ায় চড়িতে আমি খুব ভাল জানি। এই দেখনা এক নিমেষে আমি বাবার ঘোড়াকে ধরিয়া ফেলিব।"

মায়ের পায়ের ধূলি লইয়া কল্যাণী ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসিল। ঘোড়া তীরের মত ছুটিয়া চলিল। রাণী পদ্মাদেবী অবাক হইয়া একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন!

———

পাঁচ

দূতের মুখে বাংলার রাজা আদিত্যবর্ম্মার স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া ভাস্করদেব জ্বলিয়া উঠিলেন। জ্বলিয়া উঠিবারই ত' কথা,—যাচিয়া তোমার মেয়ে ঘরে আনিতে চাহিলাম,—তার পরিবর্ত্তে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিলে!

স্রোতস্বতী করতোয়া। তার অপর পারে ভাস্করদেবের ছাউনী পড়িয়াছে। অসংখ্য শিবির, —দেখিয়া মনে হয়, ওপারে যেন কে একখানা সাদা কাপড় বিছাইয়া রাখিয়াছে। এপারে

থাকিয়া জয়ন্ত এই সব দেখিয়া দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। কুমার অরুণবর্ম্মা কহিলেন—"জয়ন্ত, আর অপেক্ষা করিয়া লাভ কি? এস, সোজাসুজি আক্রমণ করি!"

হাসিয়া জয়ন্ত কহিলেন—"পাগল! নদীতে নামিলে একখান কুটা দশখান হয়, তোমার সাধ্য কি তুমি অপর তীরে যাইয়া উঠ।"

রাত্রি হইল। ভাস্করদেবের শিবিরের নানা দিকে উনানের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অরুণবর্ম্মা কহিলেন "জয়ন্ত, এই উপযুক্ত সময়।"

জয়ন্তের শিবিরে কেহ একটি দীপ জ্বালিল না,—খাবার তৈরীর জন্য একটা উনানও জ্বলিল না। জয়ন্ত আদেশ করিলেন, এই অন্ধকারে অপর তীরে পৌঁছিতে হইবে। দারুণ শীত—সৈন্যদল হাসিমুখে শিবির গুটাইল, ঘোড়া সাজাইল, তারপর এ ওকে কোলাকুলি করিয়া, হাতে বর্শা লইয়া নীরবে অন্ধকারে নদীর তীর বাহিয়া চলিল। অনেক দূরে নৌকা সাজানো

আছে; বাংলার সৈন্যদল ধীরে ধীরে নৌকায় নদী পার হইতে লাগিল।

ভাস্করদেব ওদিকে নিশ্চিন্ত ছিলেন না—তাঁর গুপ্তচর ছিল সর্ব্বত্র। শিবিরে বসিয়া কামরূপরাজ জানিতে পারিলেন, শত্রুরা নদী পার হইতেছে। ভাস্করদেবের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কুমার অরুণবর্ম্মার সৈন্যদল তখন কেবলমাত্র তীরে উঠিতেছে, ভাস্করদেবের সৈন্য আসিয়া ঝড়ের মত তাহাদের উপর পড়িয়া গেল। নদীর মধ্য-খানে থাকিয়া জয়ন্ত অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা ও সৈন্যদের চীৎকার শুনিতে পাইলেন। নিতান্ত অনিচ্ছায় জয়ন্ত হুকুম করিলেন—"আমার একটি সৈন্যও এখানে উঠিবে না, নৌকা উজাইয়া চল।"

ওদিকে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়াছে। কুমার অরুণ-বর্ম্মা তীরের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু জয়ন্ত কোথায়? জয়ন্তের সৈন্য দল কোথায়? ভীরু কাপুরুষ কি তবে পিছন ফিরিয়া পলায়ন করিল নাকি?"

অরুণবর্ম্মার অল্প সৈন্যই তীরে উঠিতে পারিয়াছিল,—তাহারা ভাস্করদেবের সৈন্যদলকে পারিয়া উঠিল না। ধীরে ধীরে প্রাণ দিতে লাগিল, কিন্তু একটি সৈন্যও পলাইল না।

কুমার অরুণবর্ম্মা একজন সৈনিককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জয়ন্ত কোথায়? তার সৈন্য কোথায়, দেখিয়াছ?" সৈনিক বলিতে পারিল না—কুমার অরুণবর্ম্মার মাথা দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন জয়ের আর আশা নাই!

সহসা চারিদিক হইতে সাতজন সৈনিক তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল,—অন্ধকারে শত্রু-মিত্র চেনা যায় না। তাহাদের মধ্য হইতে কে হাঁকিল "বধ করিও না, বন্দী কর।" কুমার অরুণবর্ম্মা বন্দী হইলেন। ভাস্করদেব কহিলেন,—"অরুণবর্ম্মা, আজ তোমার শেষ দিন।"

ভাস্করদেব বন্দীকে লইয়া নিজের শিবিরে গেলেন। কামরূপরাজের শিবিরে শিবিরে আজ মহা জয়োল্লাস। কেহ হাসিতেছে, কেহ নাচিতেছে,

কেহ মাদল বাজাইয়া গান করিতেছে! তারপর গভীর রাত্রে সবাই আলো নিবাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর চাঁদখানি তখন ডুবিয়া যাইতেছে। জয়ন্ত তাঁর বিশাল সৈন্যদল পিছনে লইয়া নিঃশব্দে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা দিলেন। দেখিলেন, শিবিরের দুয়ারে দুয়ারে প্রহরী ঘুমাইতেছে,—প্রহরীর হাতের হাতিয়ার ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে। জয়ন্ত হাসিলেন,—জয়ের আনন্দ আরও একটু ভোগ করিয়া লও, তারপরে শেষ আনন্দ দেখাইয়া দিব!

জয়ন্তের সঙ্কেতে এক এক দল সৈন্য, এক একখানা শিবির ঘিরিয়া ফেলিল; নিদ্রিত প্রহরীর হাতিয়ার কাড়িয়া লইল। জয়ন্ত কহিলেন; "ঘুমন্ত শত্রুকে কখনও আঘাত করিবে না।"

সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়া জয়ন্ত রাজার শিবিরে গেলেন। প্রকাণ্ড শিবির,—রাজা এক কক্ষে নিদ্রা যাইতেছেন। জয়ন্তের বিংশ জন

সেনানী সেই শিবির ঘিরিয়া রহিল। জয়ন্ত একাকী সেই শিবিরে প্রবেশ করিলেন। পদশব্দে রাজা ভাস্কর জাগিয়া উঠিলেন,—"কে তুমি?" সঙ্গে সঙ্গে হাতিয়ার লইতে যাইয়া দেখেন, তরোয়াল নাই—খাপখানা পড়িয়া আছে। ক্রুদ্ধ ভাস্করদেব হুঙ্কার দিলেন "প্রহরী!'

জয়ন্ত হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"মহারাজ, আমিই আপনার প্রহরী, আমায় আদেশ করুন!"

মহারাজ নির্ব্বাক! তাঁর মুখের উপর কথা কয়! কে তুমি? অন্ধকার শিবির! জয়ন্ত সঙ্কেত করিলেন, একজন বাঙ্গালী সৈন্য আলো লইয়া আসিল। রাজা ভাস্করদেব চম্‌কাইয়া উঠিলেন।

জয়ন্ত কহিলেন,—"রাজা, বালকের সঙ্গে যুদ্ধ জয় করিয়া মনে করিয়াছিলে বাংলার দর্প চূর্ণ করিলাম; কিন্তু তাহা সহজ নহে। বল, কুমার অরুণবর্ম্মা কোথায়?"

রাজা উত্তর করিলেন—"তোমার স্পর্দ্ধা দেখিয়া আমার বিস্ময় লাগিতেছে। অরুণবর্ম্মা আমার বন্দী! তাঁর মুক্তি নাই।"

জয়ন্ত যেন আকাশ হইতে পড়িলেন—মুক্তি নাই! তবে মহারাজ, আমায় বন্দী করুন—যুবরাজকে ছাড়িয়া দিন।"

ভাস্করদেব তখনও তাঁর অবস্থা বুঝিতে পারেন নাই; তিনি অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন,—"যুবক, তোমায় মুক্তি দেব? তুমিও আমার বন্দী।"

জয়ন্ত আর অপেক্ষা করিলেন না, কহিলেন, "ভাস্করদেব, দেখ তোমার কি অবস্থা হয়!" জয়ন্ত রণভেরিতে ফুৎকার দিলেন, পাঁচজন সৈন্য শিবিরে প্রবেশ করিল। জয়ন্ত কহিলেন, "বাঁধো। ভাস্করদেব, তোমায় যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখাইয়াছি। ইচ্ছা করিলে তোমার সকল সৈন্যকে তরোয়ালের ডগায় এই নদীর মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে পারিতাম; কিন্তু বাংলার

সেনাপতি নিদ্রিত শত্রুকে আঘাত করে না। তোমার প্রত্যেক শিবির আমার অধিকৃত, তোমার প্রত্যেক সৈন্য আমার বন্দী। রক্তপাতে আমার ইচ্ছা নাই। যদি নিজের মঙ্গল চাও, নিজের রাজ্যে ফিরিয়া যাও, বাংলার দিকে আর মুখ ফিরাইও না।”

ভাস্করদেব এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তিনি বাহিরে আসিলেন। তাঁর প্রত্যেকটি শিবির ঘিরিয়া বাংলার সৈন্যেরা খোলা তরোয়াল হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ভাস্করদেবের মুখ কালো হইয়া গেল।

জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি চাও রাজা? নিজের মৃত্যু? না মুক্তি? আমি সঙ্কেত করিলে তোমার সকল শিবির লুণ্ঠিত হইবে, তোমার সকল সৈন্য বন্দী হইবে, তাদের বাঁধিয়া লইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাস্তায় পাথর ভাঙ্গাইব। বল কি চাও?”

ভাস্করদেব বিস্মিত হইলেন,—এই তরুণ যুবা! তাঁর কণ্ঠে কি তেজ, মুখে কি দীপ্তি! রাজা কহিলেন,—"যুবক, তোমার বীরত্বে ও মহত্ত্বে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমার ধারণা ছিল, তোমার দেশের লোকেরা বুঝি অস্ত্র ধর্‌তে জানে না। আজ থেকে বাংলার রাজা আমার বন্ধু—"

ভাস্করদেব জয়ন্তকে আলিঙ্গন করিলেন।

পূর্ব্ব আকাশের তীরে তখন সোণার অরুণের আভা আসিয়া পড়িয়াছে!

———

ছয়

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সবাই ফিরিয়াছে, কিন্তু জয়ন্তের দেখা নাই। মহারাজ আদিত্যবর্ম্মা অর্দ্ধেক পথ হইতেই যুদ্ধ জয়ের সংবাদ পাইয়া রাজ্যে ফিরিয়াছিলেন। একে একে সকল সেনা-পতিকে সঙ্গে করিয়া কুমার অরুণবর্ম্মা রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"জয়ন্ত কোথায় ?"

অরুণবর্ম্মা কহিলেন—"মহারাজ, যুদ্ধ জয়ের পর আমরা যে যার নৌকায় উঠিলাম। সকলে

যাত্রা করিলে জয়ন্ত তাঁর নিজের ছিপে যাইয়া উঠিলেন, তারপর তাঁর সঙ্গে আর দেখা নাই।”

মহারাজ আদিত্যবর্ম্মা চিন্তিত হইলেন। কাল রাত্রে ভীষণ দুর্য্যোগ গিয়াছে—তবে কি? চিন্তিত হইয়া রাজা দিকে দিকে চর পাঠাইলেন, চরেরা ঘোড়ায় চড়িয়া নানাদেশে ছুটিয়া গেল, কিন্তু জয়ন্তের দেখা মিলিল না! রাজা মুখ ভারি করিয়া ভিতরে গেলেন।

কল্যাণীর মুখে আর হাসি নাই।—ছুটিয়া আসিয়া কহিল—“বাবা, খবর পেয়েছ?” রাজার গম্ভীর মুখ দেখিয়া রাজকন্যার মুখ মলিন হইল, আশা নিবিয়া গেল। কল্যাণী যাইয়া শয়নঘরে দুয়ার দিলেন।

* * *

এমনি করিয়া দিন যায়। কল্যাণীর দিন আর কাটে না। রাণী মেয়ের অবস্থা দেখিয়া ভাবনায় পড়িলেন। নানা জায়গা হইতে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব আসিল। বিয়ের কথা উঠিলে কল্যাণী

সেখান হইতে উঠিয়া যাইয়া ঘরে দুয়ার দেয়, চোখের জলে তার বুক ভাসিয়া যায়! রাণী মেয়ের 'ভাব-সাব' দেখিয়া ঘটকদের বিদায় দিলেন।

কল্যাণী কহিলেন—"বাবা, আমি দেশ ভ্রমণে যাব।"

রাজা আদিত্যবর্ম্মা ভাবিলেন বিদেশে নানা দেশ ঘুরিলে হয়ত মেয়ের মন ভাল হইতে পারে। রাজা কহিলেন, "কোথায় যাবি মা?"

কল্যাণী উত্তর করিলেন—"যেদিকে দু' চক্ষু যায় সেই দিকে যাব।"

বজরা সাজিল। লোক-লস্কর বাছিয়া লইয়া রাজার মেয়ে কল্যাণীদেবী দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। রাণী আসিয়া দেবতার নির্ম্মাল্য মাথায় রাখিয়া মেয়ের কপালে চুমা দিলেন।

কল্যাণীর চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল।

———

সাত

কর্ণাটের রাণী রন্নাদেবীর ভয়ে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। রাণীর অসীম প্রতাপ। রন্না-দেবীর বাপ ছিলেন রাজা শিলাদিত্য। শিলাদিত্য যখন বাঁচিয়া ছিলেন, তখন কাশ্মীরের রাজার ছোট ছেলে ললিতাদিত্যের সঙ্গে তাঁর আদুরে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। ললিতাদিত্যের বড় ভাই বজ্রাদিত্য বলিয়া পাঠাইলেন,—কাশ্মীরের নিয়ম মত কর্ণাটের রাজাকে মেয়ে কাশ্মীরে লইয়া আসিয়া বিবাহ দিতে হইবে।

শিলাদিত্য কহিলেন—"তাও কি হয়? আমার সাত গণ্ডা ছেলে নাই, দশটা মেয়ে নাই, —ছেলে বলিতেও রম্না, মেয়ে বলিতেও রম্না। মেয়ের বিয়েতে আমি কত জাঁকজমক কর্‌ব, আমোদ আহ্লাদ কর্‌ব, তা' কাশ্মীরে যাইয়া বিয়ে দেওয়া—সে' আমি পারিব না।" শিলাদিত্য বিয়ের কথা ফিরাইয়া দিলেন।

পূর্ব্বে-ই বলিয়াছি বজ্রাদিত্য বড়ই ভাল লোক ছিলেন, তিনি ইহা বড় একটা গায় মাখিলেন না। কিন্তু ললিতাদিত্য মনে মনে বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন,—"ক্ষুদ্র কর্ণাটের এত বড় কথা কেন?" ললিতাদিত্য কর্ণাটের দূতকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিলেন।

ততদিন শিলাদিত্য মারা গিয়াছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে রম্নাদেবী হইলেন কর্ণাটের রাণী। রম্নাদেবীর মনটা ছিল ফুলের মত কোমল, যখন রাজদণ্ড হাতে লইয়া রম্নাদেবী রাজ সভায় বসিতেন, তখন লোকে বলিত—"এমন

রাণী না হইলে সিংহাসনে শোভা পাইবে কেন ?”

রাজা হইয়া ললিতাদিত্য প্রথমে কর্ণাটের দিকে নিজের সৈন্য চালনা করিলেন। ললিতাদিত্য কর্ণাট আক্রমণ করিতে আসিতেছেন—রত্নাদেবীর কাণে এই কথা গেল। রাণী ভয় কাকে বলে জানেন না। পাত্র মিত্র সভাসদ সবাই পরামর্শ দিলেন,—“মহারাণী, সন্ধি করুন।”

কথা শুনিয়া রত্নাদেবীর চোখ দিয়া আগুণ ছুটিল, কহিলেন, “শিলাদিত্যের কন্যা কোমল হস্তে রাজদণ্ড ধরেন না। কাশ্মীরের পার্ব্বত্য জন্তুদের বিনা আয়াসে দূর করিতে পারে—কর্ণাটের সে ক্ষমতা আছে।”

মন্ত্রী গিরিধর পুরাণো মানুষ,—অনেক দিন রাজার চাকুরী করিয়াছেন। তিনি কহিলেন,—“মা অত জেদ করা ভাল নয়, ললিতাদিত্য বড় ভয়ঙ্কর শত্রু, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করিলে সোণার কর্ণাট ছারেখারে যাইবে।”

বীর রাণী উত্তর করিলেন,—"তাই বলিয়া বিনা প্রতিবাদে নিজের রাজ্য পরের হাতে তুলিয়া দিব, গিরিধর ?"

কর্ণাট রাজ্যের সীমানার নিকটে আসিয়া ললিতাদিত্য সংবাদ পাঠাইলেন,—"রাণী রন্নাদেবী যদি কাশ্মীরের বশ্যতা স্বীকার করেন, তবে ললিতাদিত্য রাজ্য আক্রমণ না করিয়া চলিয়া যাইবেন।"

কি দয়া—কি করুণা ! রাণী রন্নাদেবী জ্বলিয়া উঠিলেন ! পাত্র মিত্র সবাই রাণীর তেজ দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন, এতটুকু মেয়ে তার এত সাহস ! রাণী তীব্রস্বরে কহিলেন,—"প্রাণ থাকিতে ললিতাদিত্যের সম্মুখে নতজানু হইয়া কর্ণাট রাজ্য ভিক্ষা লইতে পারিব না"।

দূত ফিরিয়া গেল।

রাণী রন্নাদেবী দরবার ছাড়িয়া ভিতরে গেলেন। দাসদাসী ছুটিয়া আসিল,—কেহ পাখা আনিল, কেহ সুগন্ধি জল আনিল। রাণী তাদের

বিদায় দিলেন ; তারপর সোনার পরিচ্ছদ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তাঁর পূজার ঘরে যাইয়া দুয়ার দিলেন। রাণীর চোখ দিয়া আঝোরে জল গড়াইয়া পড়িল !

রাণী একখানি সোণার পেটিকা বাহির করিলেন। সোণার পেটিকা খুলিতেই ছোট একখানি ছবি বাহির হইয়া পড়িল।—দেখিয়া দেখিয়া রাণীর চোখের পলক আর পড়ে না—চোখের জল আর থামে না।

ছবি রাজা ললিতাদিত্যের !

রাণীর মনের খবর কেউ জানে না !...

দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র কর্ণাট রাজ্য যুদ্ধের নাচে নাচিয়া উঠিল। রাণী রত্নাদেবীর আদেশ পাইয়া কর্ণাটের বীরেরা দেশ রক্ষার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। রাণীর চোখে নিদ্রা নাই, কাজে অলসতা নাই ; দিবারাত্র তিনি যুদ্ধের আনন্দে মাতিয়া রহিলেন।

এদিকে ললিতাদিত্য কর্ণাটের শ্যামল প্রান্তরে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। তার সৈন্যেরা শস্য

লুঠিল, কর্ণাটের প্রজাদের ঘরে আগুন ধরাইয়া দিল, সম্মুখে যাকে পাইল তার মুণ্ড কাটিয়া গাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখিল। তবু কর্ণাট-রাণী ভীত হইলেন না; কিন্তু প্রজার দুঃখে তাঁর মন কাঁদিয়া উঠিল।

ঐ খোলা তরোয়াল হাতে করিয়া অট্টহাসি হাসিয়া কাশ্মীরী সৈন্য ছুটিয়া আসে পালা, পালা পালা! ললিতাদিত্য যাইয়া দেখেন গ্রাম জনশূন্য, কোন ঘরে কোন লোকজন নাই; নিজের ঘর, ক্ষেত খামার ছাড়িয়া সবাই চলিয়া গিয়াছে। মহা আনন্দে কাশ্মীরের সৈন্যদল গ্রামের লোকের জিনিষ লুটিয়া লইল। তাঁবু পড়িয়াছে—কাশ্মীরের সৈন্যদল হয়ত খাইতে বসিয়াছে—হঠাৎ পাহাড় ফুঁড়িয়া হাজার হাজার তীর আসিয়া তাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ললিতাদিত্যের সৈন্য আহার ছাড়িয়া অসি ধরিল, রাণীর সৈন্য যে অন্ধকার হইতে আসিয়াছিল—সেই অন্ধকারেই লুকাইল

কর্ণাটরাণী ললিতাদিত্যের সামনাসামনি যুদ্ধ না করিয়া এমনি চাতুরী করিয়া ললিতাদিত্যকে অপদস্ত করিতে লাগিলেন। আজ রসদের গাড়ী ধরা পড়ে, কাল প্রহরীদের কে হত্যা করিয়া যায়, ললিতাদিত্য কিছুই করিতে পারেন না। বিদ্যুৎ চমকের মত কর্ণাট-সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হয়, কণ্ঠে তাদের রাণীর জয়ধ্বনি, হাতে তীক্ষ্ণ অসি, মুহূর্ত্তে কাশ্মীরী সৈন্যদলে বিপ্লব বাঁধাইয়া আবার পর্ব্বতের কোণে কোথায় লুকাইয়া পড়ে।

ললিতাদিত্য চিন্তায় পড়িলেন। ললিতাদিত্যের প্রধান সেনাপতি বিষ্ণুদত্ত ভারি সেয়ানা লোক। তিনি কহিলেন "রাণীর প্রাসাদ আক্রমণ করিতে হইবে।" ললিতাদিত্য রাজী হইলেন।

সৈন্য সাজিল। রাণী রত্নাদেবী গুপ্তচরের মুখে খবর পাইলেন। তিনি কহিলেন,—"আমায় বন্দী করিবার উদ্দেশ্য, উত্তম, রত্নাদেবী কখনো ধরা

দিবে না!" সৈন্যসামন্ত লইয়া রাজা ললিতা-দিত্য রাণীর প্রাসাদ দখল করিলেন। অত বড় প্রাসাদ,—লোকজন একটি নাই, সবাই যেন বাতাসে উড়িয়া গিয়াছে। রাজা ললিতাদিত্য এঘর ওঘর সমস্ত ঘর খুঁজিয়া রাণী ত' রাণী একটা কুকুর বিড়ালও দেখিতে পাইলেন না।

ললিতাদিত্যের সৈন্য প্রাসাদ জাঁকাইয়া বসিয়া রহিল। রাত্রি হইয়াছে। যে ঘরে রাণী রত্নাদেবী নিদ্রা যাইতেন, রাজা ললিতা-দিত্য সেই ঘরে সেনাপতিদের সঙ্গে মন্ত্রণা করিতেছেন। রাজার আদেশে কাশ্মীরের সৈন্যগণ প্রাসাদের একটা খড়কুটায় হাত দেয় নাই। রাজা পরামর্শ শেষ করিয়া পূজার মন্দিরের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দরজা বন্ধ ছিল, রাজা ভিতরে গেলেন—দেখিলেন আসনের উপরে এক স্বর্ণপেটিকা! কম্পিত হস্তে রাজা পেটিকা খুলিলেন,—দেখিলেন ক্ষুদ্র একখানি ছবি! ছবি কার? রাজার হাত হইতে

ছবিখানা মাটিতে পড়িয়া গেল। রাণী রত্নাদেবী প্রাসাদ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সময় তাড়াতাড়িতে ললিতাদিত্যের ছবিখানা লইয়া যাইতে পারেন নাই।

গম্ভীর মুখে ললিতাদিত্য বাহিরে আসিলেন। সেনাপতিকে ডাকিয়া কহিলেন—"সৈন্যদের আদেশ দাও, আমি কান্যকুব্জ আক্রমণ করিব। এক প্রহরের মধ্যে কর্ণাট পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

সেনাপতি উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিলেন, কঠোরস্বরে ললিতাদিত্য কহিলেন—"যাও, উত্তর করিও না।"

ললিতাদিত্যের শরীররক্ষী রাজার অশ্ব লইয়া আসিল। রাত্রির অন্ধকারে রাজা কর্ণাট পরিত্যাগ করিলেন।

এক ফোটা চোখের জল বুঝি তাঁর চোখ দিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছিল!

আট

তল্‌তল্‌ ছল্‌ছল্‌ বেগে ছিপ চলিয়াছে!—বড় সুন্দর ছিপখানি, গড়ন তার রাজহংসের মত। তালে তালে গান গাহিয়া বাংলার নাবিকেরা দাঁড় ফেলিতেছে। তীরে দাঁড়াইয়া ছেলেমেয়ের আর ঘোম্‌টাপরা বৌয়েরা অমন সুন্দর নৌকার দিকে চাহিয়া আছে। কেহ কহিল—রাজার না'ও, কেহ কহিল, না,ওরা ডাকাত! ছিপের গোড়ায় বাংলার রাজার নিশান ওড়ে।

সকলের নৌকা আগে চলিয়া গিয়াছে। বাংলার সেনাপতি জয়ন্ত সকলকে তাদের নৌকায় উঠাইয়া শেষে ছিপে উঠিলেন। আজ জয়ন্তের মনে কত আনন্দ! যুদ্ধ জয়ের আনন্দ—কতক্ষণে রাজার সঙ্গে দেখা করিবেন, কতক্ষণে কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইবে,—জয়ন্ত তাহাই ভাবিতেছিলেন। জয়ন্তের অতীতের কথা মনে পড়িল। সেই ছোটকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া করিয়া নিজের অদৃষ্টের সঙ্গে আড়াআড়ি করিয়া চলিয়াছে সে! আজ যুদ্ধজয়ের পরে তাঁর কেবল একখানি মুখ মনে পড়িতেছিল—সে তাঁর মা'র মুখ!

জয়ন্ত চোখের জল ঢাকিতে জলের দিকে চাহিলেন।

ঈশান কোণে মেঘ উঠিল। দাঁড়ের মাঝি হাঁক দিল "সামাল"! শক্ত করিয়া দাঁড় ধরিয়া নাবিকেরা জয়ধ্বনি করিল। জয়ন্ত হাসিলেন, কহিলেন—"ঐটুকু মেঘ দেখিয়া এত ভয় কেন, জয়সেন?"

সেনানী জয়সেন কহিল—"আর্য্য, মেঘের রকম ভাল নয়। তীরে নৌকা ভিড়াইতে বলিব কি ?"

জয়ন্ত প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"তোমার ভয় থাকে, তুমি নামিয়া যাইতে পার।" নৌকা ঝড়ের বেগে ছুটিয়া চলিল।

অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের চক্‌মকি। জয়সেন কহিল—"আর্য্য, এখন উপায় ?"

তেমনি সহজ কণ্ঠে জয়ন্ত উত্তর করিলেন—"প্রাণের এত মমতা জয়সেন ? তবে কামরূপের সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলে কেন ?"

সোঁ সোঁ করিয়া বাতাস উঠিল,—কড়্ কড়্ শব্দে বজ্র যেন মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। পাথরের পুতুলের মত জয়ন্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন। মত্ত নদী আরো পাগল হইয়া উঠিয়াছে। সাদা ফেণা মাথায় করিয়া ঢেউয়ের পর ঢেউ আসিয়া নৌকার গায়ে ফাটিয়া পড়িতেছে। বাংলার সেনানীরা

তেমনি গান গাহিয়া চলিয়াছে—জয় মায়ের জয়! নির্ভীক নিষ্কম্প বীরের দল! তাদের চোখে এতটুকু ভয়ের ভাব নাই! মুখে হাসি,—অটল পাথরের মত নিজের স্থানটিতে বসিয়া কাজ করিয়া চলিয়াছে!

ঐ একটা বিরাট ঢেউ আসে—বুঝি গ্রাস করিয়া ফেলে! জয়ন্ত দেখিলেন—মৃত্যু নিশ্চয়। কহিলেন "ভাই, আজ মরিব বলিয়া দুঃখ নাই; মরিয়া যেন আবার এই দেশেই জন্ম নিই, তোরা তাই প্রার্থনা কর্!"

আর বেশী দেরী নাই! ঝলকে ঝলকে জল আসিয়া নৌকা ভিজাইয়া, ডুবাইয়া দিতেছে,—উপর হইতে ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। চারি দিকে কেবল অন্ধকার, শুধু অন্ধকার! হালের মাঝি তেমনি বুক ফুলাইয়া বীরের মত হাল ধরিয়া বসিয়া আছে। অত বড় ছিপখানা ঝড়ে মোচার খোলার মত দুলিতেছে, ডুবিতেছে, আবার উঠিতেছে।

কড়্ কড়্ কড়্!—আকাশ ফাটিয়া পড়িল! আর এক লহমা—একটা ভীষণ ঝাপ্টা আসিয়া সব শেষ করিয়া দিল। জয়ন্ত মায়ের নামে ঝাঁপ দিলেন। কোথায় গেল মাঝি, কোথায় গেল নৌকা, কেউ বলিতে পারিল না!

* * *

সকাল হইয়াছে। প্রশান্ত নদী সোণালি আভায় ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল, যেন সারা রাত্রির মধ্যে তার কিছুই হয় নাই!

তীরে নৌকা বাঁধিয়া কান্যকুব্জ-রাজের সভা-কবি পণ্ডিত বাক্‌পতি মিশ্র জলে নামিয়া তর্পণ করিতেছিলেন!— 'জবাকুসুম সঙ্কাশং'— দূরে একটা কালো জিনিষ যেন কি ভাসিয়া যাইতেছে না? কবি বৃদ্ধ হইয়াছেন, দৃষ্টিশক্তি তত প্রখর নয়, মাঝিদের কহিলেন, "দেখত বাবা, ওটা কি ভাসিয়া যায়?" মাঝিরা দেখিল একটা মানুষ! তাড়াতাড়ি দুইজন জলে নামিয়া ধরাধরি করিয়া তীরে উঠাইল।

কবির সন্ধ্যাহ্নিক পড়িয়া রহিল। তিনি তীরে উঠিলেন, দেখিলেন, দেখিয়া কহিলেন "বাঃ সোণার ছেলে, এ কার রে! যেন রাজপুত্রটি!"

কবির হৃদয় গলিয়া গেল।

মাথা ঝাঁকাইয়া, পা ধরিয়া ঘুরাইয়া নানা চেষ্টা করিয়া, কবি দেখিলেন যুবকের ঠোঁট নড়িতেছে। আনন্দে কবি নিজের বাক্স হইতে ঔষধের শিকড় বাঁটিয়া যুবকের মুখে দিলেন। অনেক পরে ধীরে ধীরে যুবক উঠিয়া বসিল। কবি কহিলেন—"কি বাবা, শরীর ভাল বোধ হচ্ছে?"

যুবক ধীরে ধীরে উঠিলেন, কহিলেন—"আমি কোথায়?"

কবি তাঁর পরিচয় দিলেন। তারপর উত্তেজক পানীয় খাওয়াইয়া তাকে নৌকার ভিতরে শোয়াইয়া দিয়া কবি স্নান করিতে নামিলেন।

যুবক কবির সহিত রহিয়া গেল। কবি যতই তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, যুবক তাঁর

দিকে শুধু চাহিয়া থাকে। বাক্‌পতি মিশ্র বুঝিলেন 'ইহার পূর্ব্ব স্মৃতি ভ্রম হইয়াছে।'

দেশের পর দেশ পার হইয়া কবির নৌকা চলিল। কবি নানা তীর্থ ঘুরিতে বাহির হইয়াছেন। এখানে তিন দিন, ওখানে এক দিন, এমনি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া কবির নৌকা কান্য-কুব্জের ঘাটে আসিয়া লাগিল। কবি শাস্ত্র পড়েন, যুবক তাঁর সম্মুখে আসন পাতিয়া চুপ করিয়া শোনে, আর মাঝে মাঝে আনন্দে হাসিয়া উঠে! কবি কবিতা বলিয়া যান, যুবক তাড়া-তাড়ি লিখিয়া লয়। কবি বাক্‌পতি লেখা তাল-পত্র খানা লইয়া দেখেন—তার এতটুকু ভুল হয় নাই!

সন্ধ্যায় নৌকার ছইয়ের উপর বসিয়া কবি বাক্‌পতি বীণ্ বাজাইতেন, যুবক তন্ময় হইয়া শুনিত,—নদীর পরপারে চাহিয়া চাহিয়া তার চোখ জলে ভরিয়া উঠিত! এক একদিন যুবক নিজ হাতে বীণ্ ধরিতেন, কবি কহিতেন " বীণ্

বাজাইতেও জান ?" কবি হাসিতেন—যুবক অস্পষ্ট ঝঙ্কারে তান ধরিতেন।

সুপ্ত গভীর রাত্রে নিদ্রা হইতে উঠিয়া যুবক নৌকার উপরে আসিয়া বসিত। তাঁর একটা বাঁশী ছিল। জ্যোৎস্নায় আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছে, যুবক গান ধরিল, বাতাসে গান ভাসিয়া ভাসিয়া দূরে বহুদূরে নদীর রেখায় মিশিয়া গেল। ঘুম হইতে জাগিয়া কবি বাক্‌পতি নিঃশব্দে বাহিরে আসিতেন, দেখিতেন যুবক বাঁশী বাজাইতেছে—বাঁশীর সুরে কান্না যেন ফাটিয়া পড়িতেছে; যুবকের চোখ বহিয়া জল ঝরিতেছে।

বাক্‌পতি মিশ্র কান্যকুব্জের রাজা যাশোধর্ম্মের রাজসভায় গেলেন—যুবক তাঁর পিছনে। অনেক দিন পরে কবিকে পাইয়া রাজা যশোধর্ম্ম আনন্দে আত্মহারা হইয়া কবিকে জড়াইয়া ধরিলেন। কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, পাশে বসাইয়া, দেশ বিদেশের কত খবর শুনিলেন, কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

বাক্‌পতি বলিলেন—"রাজা, তোমার মনে মনে যেন শান্তি নাই মনে হইতেছে।" রাজা কহিলেন—"বাক্‌পতি, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের রাজ-চক্রবর্ত্তী হইবার আশায় আমি উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছি। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের গৌরব যশো-ধর্ম্মের কেন হইবে না? থানেশ্বরের প্রান্তরে যে সূর্য্য অস্ত গিয়াছে—আমি তারই পরিবর্ত্তে নূতন তপনের সৃষ্টি করিব।"

বাক্‌পতি ব্যথিত হইলেন। যুদ্ধ বিগ্রহ তাঁর ভাল লাগে না। কহিলেন, "রাজা, নিজের অবস্থায় যে খুসী নয়, সে কখনো কি সুখী হয়?"

রাজা কহিলেন—"কাশ্মীরের ললিতাদিত্য দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছে। শুনিয়াছি তাঁর লক্ষ সৈন্য লইয়া সে আমার বিরুদ্ধে কর্ণাট হইতে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছে। তাঁর স্পর্দ্ধার সমুচিত শাস্তি তাঁকে দিতে হইবে।"

রাজার কাছে বিদায় লইয়া বাকৃপতি ঘরে ফিরিলেন। কবির সংসারে কেহ নাই। স্ত্রী

তাঁর অনেক দিন গত হইয়াছেন—বাক্‌পতি আর বিবাহ করেন নাই। যুবক কবির জন্য ফুল তুলিল, পূজার সজ্জা সাজাইয়া রাখিল, দেবমন্দির মার্জ্জনা করিল—বাক্‌পতির মুখে আনন্দ আর ধরে না। বাক্‌পতি রাঁধেন, যুবক তাঁর প্রসাদ পায়। তারপর কবি যখন সুর করিয়া শাস্ত্র পাঠ করেন, যুবক মাঝে মাঝে তাঁর ভুল ধরিয়া দেয়, কবি হাসিয়া কহেন—"বাবা, বুড় হয়েছি, আর কত!"

নদীতীরে বাড়ীখানি—বাড়ীর আশেপাশে বড় সুন্দর সাজানো বাগান। যুবক সকাল-সন্ধ্যায় নদীতীরে আসিয়া বসেন। হাতে তাঁর সেই বাঁশীটি! রহিয়া রহিয়া বাঁশী কাঁদিয়া ওঠে,—যুবক আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যায়,—বাঁশী আর থামে না। দিগদিগন্তে সেই সুর ভাসিয়া চলে, কার উদ্দেশ্যে কেউ জানে না! নদী বাহিয়া কত নৌকা পান্‌সী ভাসিয়া আসে—আবার চলিয়া যায়।.........

এম্‌নি করিয়া দিন যায়।

এম্‌নি সে এক দিন! আকাশ পাত্‌লা মেঘে ঢাকিয়া আছে! দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি ঝরিতেছে! যুবক নদী-তীরের গাছের তলায় বসিয়া বাঁশীর তান ধরিয়াছে। আজ বাঁশী বড়ই করুণ, তার প্রতি তানে যেন বুক ফাটিয়া যায়, প্রতি ঝঙ্কারে যেন শোক উথলিয়া উঠে। কত দিনের সঞ্চিত ব্যথা বাঁশীর তানে ঝরিয়া পড়ে!

তেম্‌নি নদী বাহিয়া কত নৌকা চলিয়াছে—বড় ছোট মাঝারি—কত! তার কোনটার পাল সাদা, কোনটার বাদামী, কোনটার পাল লাল! নদীর মধ্যখান দিয়া একটা সাজানো বজরা চলিয়াছে। বজরায় বাংলার রাজার নিশান ওড়ে। রাজার মেয়ে কল্যাণী সেই বজরায় দেশ বিদেশে চলিয়াছেন।

বাঁশীর সুর কল্যাণীর কাণে গেল। কল্যাণী নৌকার বাহিরে আসিলেন,—কে? এমন বাঁশী কে বাজায়? কল্যাণীর বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল!

কহিলেন—"অরুণ, এইখানে নৌকা রাখো, ভাই।" কুমার অরুণবর্ম্মা কহিলেন—"এখানে কেন?" কল্যাণী কহিলেন,—"আমি বাঁশী শুন্‌ব। এ বাঁশীর সুর ত' জয়ন্তের, অরুণ।"

ধীরে ধীরে বজরা আসিয়া ঘাটে লাগিল। তখনো বাঁশী তেমনি বাজিতেছে। কল্যাণী ধীরে ধীরে গাছের ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁর পা কাঁপিয়া উঠিল। যুবকের খেয়াল নাই—চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে—কল্যাণী ডাকিলেন —"জয়ন্ত!"

জয়ন্ত! যুবক পিছন ফিরিয়া দেখে—রাজ-কন্যা কল্যাণী?

জয়ন্তের মনে একে একে পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। কহিলেন, "তুমি এখানে কেন রাজকন্যা?" 'রাজকন্যা'?—'কল্যাণী' নয়?

কল্যাণী কহিলেন "তোমার এই বেশ, জয়ন্ত!"

অরুণবর্ম্মা আসিলেন, জয়ন্তকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, কহিলেন—"জয়ন্ত, ঘরে ফিরিয়া চল।"

জয়ন্তের চোখ দিয়া দরদর বেগে জল ঝরিল।

জয়ন্ত কহিলেন—"তোমাদের কি ভুলিতে পারি, ভাই? কবি বাক্‌পতি আমার জীবন দিয়াছেন, তাঁর ঋণ শোধ না করিয়া বাংলায় ফিরিব না, কুমার। তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও, দেখিবে প্রয়োজনের সময় জয়ন্ত তোমাদের কাছে আবার যাইবে।"

অভিমানে কল্যাণীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যার জন্য দেশবিদেশ কতই না বৃথা ঘুরিয়াছি, কত ব্যথা পাইয়াছি। আহা, সে ব্যথা ত' বুঝিল না সে—কল্যাণী আর কথা বলিলেন না।

কুমার অরুণ জয়ন্তকে কত সাধিলেন, জয়ন্ত বারংবার কহিলেন, "দুঃখ করো না ভাই! আমি আবার যাব। বাংলা আমার মা, বাংলার মাটি আমার জীবন, আমি কি তা ভুলতে পারি?"

জয়ন্ত হাসিলেন। জয়ন্ত—এই কি সেই জয়ন্ত? কল্যাণীদেবী নীরবে আসিয়া বজরায়

উঠিলেন। বজরা বাংলার দিকে ফিরিয়া চলিল।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে ফিরিয়া কল্যাণীদেবী শয্যা নিলেন। কারো সঙ্গে কথা বলেন না—তাঁর মুখ দেখিলে বড় দুঃখ হয়। চুলে তেল পড়ে না, জল পড়ে না, জট ধরিয়াছে; রাণী আসিলে কল্যাণী কাঁদিয়া ভাসায়। খাইতে বসিলে অর্দ্ধেক খাইয়া কল্যাণী উঠিয়া পড়ে; দিন দিন সোণার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল!

রাজা আদিত্যবর্ম্মা সব শুনিলেন; শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

———

নয়

মানুষের আশা মানুষে ভাঙ্গে। ভগবান শুধু দেখিয়া দেখিয়া হাসেন।

কান্যকুব্জের রাজা যশোধর্ম্মের অসীম আশা চূর্ণ হইয়া গেল। যশোধর্ম্ম সমস্ত ভারতের সম্রাট্ হইতে চাহিয়াছিলেন, কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের সঙ্গে তিনি আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিন দিন তিন রাত্রি যুদ্ধের পর যশোধর্ম্মদেবের পরাজয় ঘটিল। যশোধর্ম্মদেব সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

ললিতাদিত্য হাতী চাহিলেন না, ঘোড়া চাহিলেন না, হাজার ভরি সোনারূপা চাহিলেন না। তিনি কহিলেন—"রাজা, তুমি বছরের শেষে আমায় রাজস্ব দিবে, আর যে সব সভাপণ্ডিত তোমাব সভা আলো করেন, আমি তাদের কাশ্মীরে লইয়া যাইব।"

সেকালে রাজাদের মধ্যে ললিতাদিত্য বড় পণ্ডিত লোক ছিলেন। কাশ্মীরের রাজার কথা শুনিয়া যশোধর্ম্ম অবাক হইয়া গেলেন। কান্য-কুব্জের রাজসভায় সে সময়ে ভবভূতি, বাক্‌পতি মিশ্র প্রভৃতি ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত বাস করিতেন। ললিতাদিত্য ইহাদের লইয়া যাইয়া কাশ্মীরে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়া দিবেন – এই হইল তাঁর বাসনা।

যশোধর্ম্মদেব আর কি করেন! ললিতা-দিত্যকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কে কার কথা শোনে! শেষে চোখেব জলে রাজা যশোধর্ম্ম সভা শূন্য করিয়া পণ্ডিতদের বিদায় দিলেন।

কবি বাক্‌পতিকেও যাইতে হইল। কবি কহিলেন—"জয়ন্ত, চল কাশ্মীর ঘুরিয়া আসি।"

জয়ন্ত পূজার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন, মাথা তুলিয়া কহিলেন—"আর্য্য, কাশ্মীরে যাইবেন কেন?"

কবি বাক্‌পতি যশোধর্ম্মদেবের পরাজয়ের কথা কহিলেন। জয়ন্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন—"কনৌজের সৈন্যদল ভাগীরথীর জলে ডুবিয়া মরিল না কেন, আর্য্য?"

জয়ন্তের চোখ জ্বলিতেছিল, কবি দেখিয়া অবাক হইলেন!

বাক্‌পতি যাইয়া ললিতাদিত্যের শিবিরে উঠিলেন।

পিছনে কবির পুঁথিপত্র ঘাড়ে করিয়া জয়ন্ত চলিল।

ললিতাদিত্য কহিলেন—"আমি বাংলা জয় করিব।" বাক্‌পতি কহিলেন—"মহারাজ, কাশ্মীরে ফিরিবেন কবে?" ললিতাদিত্য উত্তর

করিলেন—"ভারত বিজয় না করিয়া গৃহে ফিরিব না।"

বাক্‌পতি রাজার বন্দনা গান করিতে লাগিলেন।

রাজার সৈন্যদল বাংলার দিকে অগ্রসর হইল। জয়ন্ত মনে মনে কাঁপিয়া উঠিল।

এদিকে মহারাজ আদিত্যবর্ম্মা মহা উৎসাহে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অদিত্যবর্ম্মা কহিলেন—"প্রাণ যায় যাবে, বিদেশীর হাতে বিনা যুদ্ধে দেশ ছাড়িয়া দিব না।" রাজা যুদ্ধের আয়োজন করেন—আর একখানি মুখ মনে পড়ে। আজ রাজা নিজে যুদ্ধে যাইতেছেন। আজ জয়ন্ত থাকিলে সে একা ললিতাদিত্যকে বিন্ধ্য পর্ব্বতের অপর পারে রাখিয়া আসিতে পারিত।

হাজার হাজার সৈন্য সাজিল। বাঙ্গলাদেশে মহারাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তের পর এত বড় যুদ্ধ-সজ্জা কেহ করে নাই। বাঙ্গলার প্রত্যেক সক্ষম যুবক সাজিয়া আসিল। যাহারা কখনও অস্ত্র ধরে

নাই, তাহারাও আসিয়া কহিল, "আমরা প্রাণ দিব।" রাজা হাসিয়া তাদের বিদায় দিলেন। প্রকাণ্ড খোলা মাঠে সারি সারি তাঁবু পড়িয়াছে—সারা দিনরাত্রি ধরিয়া সৈন্যদের আনাগোনা, কুচ্‌ কাওয়াজ। রাজধানীর একদিকে প্রকাণ্ড হাপর জ্বলিয়াছে; তাতে বাঙ্গলার মিস্ত্রিরা দিবারাত্র লোহা গলাইয়া অস্ত্র তৈয়ার করিতেছে। কুমার অরুণবর্ম্মা চারিদিকে তদারক করিতেছেন।

বাংলার যেদিন গিয়াছে—সেদিন আর আসিবে না!

ভোর রাত্রে ডঙ্কা বাজিল,—আজ যুদ্ধ জয়ের যাত্রা! নহবৎখানায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণস্বরে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। তালে তালে পা ফেলিয়া হাজার হাজার বাঙ্গালী সৈন্য হাসিমুখে চলিয়াছে, ললিতাদিত্যকে বিন্ধ্যপর্ব্বতের পরপারে দূর করিয়া দিতে হইবে।

রণভেরী বাজিয়া উঠিল—রাজা আদিত্যবর্ম্মা যাইয়া প্রকাণ্ড সাদা ঘোড়ায় উঠিলেন। রাজ-

পুরোহিত রাজার ললাটে জয়টীকা আঁকিয়া দিলেন—পুরাঙ্গনাগণ জয় শঙ্খ বাজাইলেন। রাণী পদ্মাবতী রাজার পায়ের ধূলি মাথায় তুলিয়া নিলেন।

কল্যাণী কাঁদিল না—কথা কহিল না। শুধু রাজার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সূর্য্য-কিরণে রাজার সোণার কিরীট জ্বল্ জ্বল্ করিতে-ছিল, সৈন্যদল রাজার জয় গাহিল। রাজা আদিত্যবর্ম্মা যুদ্ধে চলিয়া গেলেন।

ঘরে আর মন টিঁকে না। কল্যাণী অধীর হইয়া উঠিল। ধাত্রী কহিল—"মা, আয় তোর চুল বাঁধিয়া দিই।"

কল্যাণী কথা কহিল না—নিজের ঘরে যাইয়া অস্ত্র দিয়া কচ্ কচ্ করিয়া সোনার বরণ চুলের গোছা কাটিয়া ফেলিল। 'হায় হায়' করিয়া ধাই আসিয়া দেখে চুল কাটা শেষ হইয়া গিয়াছে। ধাই কাঁদিতে লাগিল—কল্যাণীর মুখে হাসি ফুটিল। চুল কাটিয়া ছোট করিয়া, কল্যাণী

পুরুষের মতন করিয়া কাপড় পরিল। মাথায় বাঁধিল গৈরিক রংয়ের পাগ্—বুকের ভিতরে একখানা শাণিত ছুরি লুকাইয়া রাখিল। মেয়ের রকম সকম দেখিয়া শুনিয়া ধাই যাইয়া রাণী পদ্মাদেবীকে ডাকিয়া আনিল।

রাণী কহিলেন—"কল্যাণি, কোথায় যাস্ মা?"

কল্যাণী হাসিয়া কহিল—"বাবার ছেলে, বাবার প্রজারা দেশরক্ষায় যুদ্ধে গেল—কেন মেয়েমানুষের কি সেখানে যেতে নাই? আমি যুদ্ধে যাব, মা।"

রাণী কত নিষেধ করিলেন। কল্যাণী কাঁদিয়া ভাসাইল—অবশেষে রাণী কহিলেন,—"তোরা সবাই চলিয়া গেলে আমি রহিব কার কাছে কল্যাণি?'

কল্যাণী কহিল—" ফিরিয়া আসিয়া তোমার পায়ের ধূলা মাথায় নিব, মা—তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘোড়া ছুটাইয়া কল্যাণী অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

ত্রিগামীর বিরাট প্রান্তর। তার এক দিকে ললিতাদিত্য আর এক দিকে মহারাজ আদিত্যবর্ম্মা। ললিতাদিত্য দেখিলেন, বাঙ্গলার সৈন্য অগুণ্তি। ইহাদের সঙ্গে পারা দায় হইবে। যুদ্ধ চলিল— সাত দিন সাত রাত্রি যুদ্ধ করিয়া কেহ কাহাকেও হটাইতে পারিল না। আট দিনের দিন ললিতাদিত্য সাদা নিশান উড়াইলেন--বাঙ্গলার রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন—"রাজা, আপোষ কর।"

আপোষের কথা চলিতে লাগিল—উপরে উপরে। রাজা ললিতাদিত্য ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তার মূলমন্ত্র ছিল, যে শত্রুকে বলে পরাজয় না করা যায়, তাকে কৌশলে আটক করিতে হয়।

ললিতাদিত্যের শিবিরের কাছে কবি বাক্‌পতির শিবির পড়িয়াছে। নিজের শিবিরে বসিয়া তার নিজের হাতে গড়া, নিজের হাতে শেখানো বাঙ্গালী সৈন্যদলের বীরত্ব দেখিয়া জয়ন্তের বড়ই আনন্দ হইতেছিল।

ললিতাদিত্যের শিবিরে শিবিরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জয়ন্ত কাশ্মীরের বহু গোপন তথ্য জোগার করিয়া ফেলিলেন। সেদিন রাত্রিকাল,— ললিতাদিত্যের শিবিরে মন্ত্রণা চলিয়াছে। জয়ন্ত দাঁড়াইয়া সব শুনিলেন—শুনিতে শুনিতে তার পা হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। জয়ন্ত শুনিলেন—ললিতাদিত্য আদিত্যবর্ম্মাকে হত্যা করিবার জন্য পরামর্শ করিতেছেন।

জয়ন্ত দেখিলেন,—অধিক রাত্রে রাজার শিবির হইতে একজন ভীষণ আকারের কাশ্মীরী সেনানী বাহির হইল। বাহির হইয়া সে অন্ধকারে বাংলার রাজার শিবিরের দিকে চলিতে লাগিল। জয়ন্ত আড়ালে দাঁড়াইলেন।

আদিত্যবর্ম্মা সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। কাল প্রাতে সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া দেশে ফিরিবেন, এই তাঁর আশা। ধীরে ধীরে অন্যের অলক্ষ্যে কাশ্মীরী সেনানী রাজার শিবিরে প্রবেশ করিল। রাজার শিয়রে পানীয় জল রহিয়াছে। তাহাতে

সে সাদা বিষের গুড়া মিশাইয়া যেমন বাহির হইতে যাইবে সম্মুখে দেখে মুক্ত তরবারি লইয়া জয়ন্ত দাঁড়াইয়া। একি! সেনানী চমকিত হইয়া পিছনে হটিল!

কবি বাক্‌পতির শিবিরে সে জয়ন্তকে বহুবার দেখিয়াছে,—মনে করিল, ললিতাদিতা বুঝি ইহাকে পাঠাইয়াছেন। সেনানী হাসিয়া সম্মুখে আসিল।

জয়ন্ত কঠোর স্বরে কহিলেন—"পিশাচ, ওখানে কি করিয়াছিস্?" মুহূর্ত্তে জয়ন্তের তীক্ষ্ণধার তরবারি সৈনিকের বক্ষ বিদ্ধ করিল। কাশ্মীরী সৈনিক বুকে হাত চাপিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল; আর উঠিল না। তার দিকে মুহূর্ত্ত চাহিয়া দ্রুত-পদে জয়ন্ত শিবিরে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, ঘুম হইতে উঠিয়া রাজা আদিত্যবর্ম্মা জল পান করিতেছেন!

জয়ন্তের বুকখানা ধ্বক্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; দৌড়াইয়া যাইয়া রাজার হাতখানি ধরিয়া

ফেলিলেন, কহিলেন—"মহারাজ, মহারাজ, ও জল ফেলিয়া দিন!" ততক্ষণ রাজার জল পান শেষ হইয়া গিয়াছে। রাজা মনে করিলেন—তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন নাকি? জয়ন্ত! জয়ন্ত কোথা হইতে আসিল?

রাজা কহিলেন,—"জয়ন্ত আসিয়াছ?—"

"মহারাজ একি পান করিলেন? সর্ব্বনাশ, শত্রুর ষড়যন্ত্র—এ জলে যে বিষ ছিল!"

তীব্র বিষের ক্রিয়া রাজার শরীরে তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পাইয়াছে। রাজার কণ্ঠ জড়াইয়া আসিতেছে,—তিনি জড়িত স্বরে কহিলেন, "জয়ন্ত, পার ত' এর প্রতিশোধ নিও।"

খবর পাইয়া অরুণবর্ম্মা আসিলেন, সেনাপতি, মন্ত্রী সবাই ছুটিয়া আসিলেন,—রাজা আদিত্যবর্ম্মা আর কথা কহিতে পারিলেন না। কপালে হাত রাখিয়া রাজা মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন।

জয়ন্ত চোখের জল আর রাখিতে পারিলেন না। অরুণবর্ম্মা, কাঁদিয়া কহিলেন, "জয়ন্ত সেই

আসা আসিলে, ভাই—আর একটু আগে আসিতে পারিলে না!"

বাংলার সৈন্য ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিল। খোলা তরোয়াল হাতে সকলের সাম্‌নে জয়ন্ত সৈন্যদল পরিচালনা করিলেন।

ললিতাদিত্য সে আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া পিছনে হটিলেন। কুমার অরুণবর্ম্মা কহিলেন—"আর যুদ্ধে কাজ কি জয়ন্ত, চল ঘরে ফিরিয়া যাই।"

জয়ন্ত চোখ মুছিয়া কহিলেন, "ফিরিয়া যাইব? রাজার শেষ কথা না রাখিয়া গৌড়ে ফিরিব কোন মুখে, অরুণ? প্রতিশোধ না লইয়া ঘরে ফিরিলে দেবতা যে অভিশাপ দিবেন, গৌড়বাসী যে ঘৃণায় মুখ ফিরাইবে।"

"তবে কি করিতে চাও?"

"এতদিন বৃথা ললিতাদিত্যের শিবিরে বাস করি নাই, অরুণ। যখন শুনিলাম, ললিতাদিত্য সমগ্র ভারত জয় করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে—

তখন হইতে চিন্তা করিয়াছি কি করিয়া তার দর্প চূর্ণ করা যায়। চিন্তার আমার শেষ হয় নাই! দিবারাত্র সেই ভাবনা ভাবিয়াছি। কাশ্মীরের বহু গুপ্ত তথা শিবিরে শিবিরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সংগ্রহ করিয়াছি। অবশেষে শুনিয়াছি অরুণ, দেবতার আশীর্ব্বাদে ললিতাদিত্য অজেয় বীর হইয়াছেন। যেদিন ললিতাদিত্যের আরাধ্য দেবতা পরিহাস-কেশবের মন্দিরে শত্রুসৈন্য প্রবেশ করিতে পারিবে—যেদিন মানবরক্তে কেশবের মন্দির রক্তাক্ত হইবে—সেইদিন তার পতন অনিবার্য্য! আমি সে রক্ত দান করিব, অরুণ! আমি আজ এক শত মাত্র সৈন্য লইয়া কাশ্মীরে রওনা হইব। জগতের চক্ষে দেখাইব—গৌড়সৈন্য কত শক্তি ধরে!"

জয়ন্ত বাছিয়া বাছিয়া এমন এক শত সৈন্য সঙ্গে লইলেন, যারা হাসিতে হাসিতে মুহূর্ত্তে প্রাণ দিতে পারে। এই অজেয় সৈন্যদল সুদূর কাশ্মীরে নিজের জীবন পণ করিয়া যাত্রা করিল।

বাংলার রাজার গুপ্তহত্যার প্রতিশোধ নিতে গৌড়-সৈন্য তরবারি স্পর্শ করিয়া জয়ন্তের সম্মুখে শপথ করিল,—"প্রাণ দিব, মান দিব না।"

অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া কুমার অরুণবর্ম্মা বাংলায় ফিরিলেন।

এগার

ললিতাদিত্যের মনে শান্তি নাই। দাক্ষিণাত্য হইতে সংবাদ আসিয়াছে রাণী রন্নাদেবী আবার বিদ্রোহ করিতেছেন। ললিতাদিত্য প্রথমে মনে করিলেন, এ জীবনে রন্নাদেবীকে আর বিরক্ত করিব না—তার যাহা মনে চায় সে করুক। কিন্তু সংবাদের পর সংবাদ আসিতে লাগিল—রাণী রন্নাদেবী তাঁর নিজের রাজ্যের সীমানা পার হইয়া সমস্ত দেশ দখল করিয়া লইতেছেন।

ললিতাদিত্য বুঝিতে পারিলেন—রন্নাদেবী

ললিতাদিত্যের সাক্ষাৎ চান। এদিকে বাংলার রাজা আদিত্যবর্ম্মার মৃত্যুতে বাংলার সৈন্যদল নিজের দেশে ফিরিয়া গিয়াছে। ললিতাদিত্যের সভাসদগণ পরামর্শ দিলেন—এইবার বাংলার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িলে আমাদের জয় নিশ্চয় হইবে।

কিন্তু রাজার আর রাজ্যজয় ভাল লাগিতেছিল না। ক্রমাগত অস্ত্রের ঝনৎকার, যুদ্ধের কোলাহল. —ললিতাদিত্য অতিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। তাঁর মনে শান্তি নাই, —বাংলার রাজাকে গুপ্তভাবে নিহত করিয়া ললিতাদিত্যের বড়ই অনুশোচনা হইল। তিনি কখনো কখনো স্বপ্নে দেখিতেন, রাজা আদিত্যবর্ম্মা যেন প্রতিশোধ নিতে ছুটিয়া আসিতেছেন। ললিতাদিত্য কহিলেন—"নাঃ, বাংলার আশা আর করিব না—আমি কর্ণাট জয় করিব।"

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে,—কাশ্মীরের রাজদূত রাণী রত্নাদেবীর প্রাসাদে যাইয়া রাণীর হাতে

ললিতাদিত্যের চিঠি দিলেন। কম্পিত হস্তে রাণী চিঠি খুলিয়া দেখেন, ললিতাদিত্য লিখিয়াছেন—"দয়া করিয়া কর্ণাট ছাড়িয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু রাণী রন্নাদেবী পুনরায় বিদ্রোহ করিয়াছেন—এবার কর্ণাট রাজ্য উঠাইয়া সাগর-জলে নিক্ষেপ করিব। যদি মঙ্গল প্রার্থনা থাকে তবে অবিলম্বে রাণী যুদ্ধ-সজ্জা ত্যাগ করুন।"

রাণী জ্বলিয়া উঠিলেন,—ডাক দিলেন—'প্রহরী!" প্রহরী আসিল—তিনি কহিলেন, "না, যাও,—দূত অবধ্য, নহিলে ইহাকে জীবন্ত সমাধি দিতাম।" দূত যে কদমে আসিয়াছিল সেই কদমে ফিরিয়া গেল।

আবার যুদ্ধ বাঁধিল।

যুদ্ধক্ষেত্রে ললিতাদিত্য কতবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাণীর দেখা পাইলেন না। সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। সবুজ ঘাসের বুকে রক্তের ঢেউ বহিয়া গেল। একটা উঁচু জায়গায় রাজা ললিতাদিত্য দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যুদ্ধ দেখিতে

ছিলেন। পাশে দাঁড়াইয়া রাজার শরীর রক্ষী রাজাকে রক্ষা করিতেছিল। হঠাৎ অন্ধকারে একটা তীর আসিয়া রক্ষীর বুকে লাগিল। আর্ত্তনাদ করিয়া সে ভূমে লুটাইল। ললিতাদিত্য সম্মুখে চাহিয়া দেখেন—রাণী রন্না! হাতে তাঁর তীক্ষ্ণ তরবারি অল্প আলোকে চক্‌ চক্‌ করিতেছে।

রাণী কহিলেন—"ললিতাদিত্য, ভগবানের নাম স্মরণ কর।"

ললিতাদিত্য চমকিয়া উঠিলেন—এই রাণী রন্নাদেবী!

রাজা কহিলেন—"রাণী যুদ্ধ বন্ধ কর—আমি নিজের রাজ্যে ফিরিয়া যাই।"

রাণী খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—"নারীর হাতে পরাজিত হয়ে কোন্‌ মুখে কাশ্মীরে মুখ দেখাবে রাজা? ভগবানের নাম স্মরণ কর। যদি ক্ষমতা থাকে তবে আত্মরক্ষা কর, ললিতাদিত্য!"

ললিতাদিত্য কোমরে বাঁধা তরবারিতে হাত দিলেন,—তাঁর কি মনে হইল, হাত নামাইয়া কহিলেন—"রন্নাদেবী, আমায় মার্জ্জনা কর, এ অস্ত্র তোমার জন্য নয়।" রাজা খাপ হইতে তরবারি ফেলিয়া দিলেন।

রাণী কহিলেন "ললিতাদিত্য, মনে পড়ে পিতাকে অপমান করিয়াছিলে?" রাণী রন্নাদেবীর হাতের তরবারি মাথার উপরে উঠিল, সহসা একটা তীর আসিয়া রাণীর বুকে বিঁধিয়া গেল। রাণী রন্নাদেবী ললিতাদিত্যের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িলেন।

রাজা শিহরিয়া উঠিলেন—কে এ তীর ছুড়িল? রাজা দেখেন তাঁরই প্রধান সেনাপতি বিষ্ণু দত্ত। "একি করিলে?"

হাসিয়া বিষ্ণুদত্ত কহিলেন—"এখনি যে আপনাকে হত্যা করিত মহারাজ! ললিতাদিত্য দুঃখে বিরক্তিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। রন্নাদেবীর মাথা নিজের কোলের উপর তুলিয়া ধরিলেন।

রাণীর গলায় মুক্তার মালা,—ললিতাদিত্য দেখিলেন, মালার মধ্যেকার সবচেয়ে বড় মুক্তাখানি যেন জ্বলিতেছে। চাহিয়া দেখিলেন, সেই মুক্তার উপরে ক্ষুদ্র একখানা ছবি—সে ছবি ললিতাদিত্যের !

ললিতাদিত্যের চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল ঝরিল। ললিতাদিত্য ক্ষিপ্রহস্তে রাণীর ক্ষত বাঁধিয়া দিলেন।

তখনো শ্বাস বহিতেছে। রাণী রত্নাদেবী কাতর কণ্ঠে কহিলেন,—"বৃথা চেষ্টা, মহারাজ। আমার সময় হইয়া আসিয়াছে। আজ আমার সবচেয়ে সুখের দিন যে, তোমার কোলে মাথা রাখিয়া মরিতে পারিলাম। আমার কর্ণাট রহিল,—তুমি দেখো, ললিতাদিত্য।"

রাণী আর কথা কহিতে পারিলেন না। বুকের ক্ষত দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত ঝরিতে লাগিল। ললিতাদিত্যের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া রাণী রত্নাদেবী চক্ষু মুদিলেন।

ললিতাদিত্য গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

ততক্ষণ যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে!

দূরে ঐ ঘোড়া ছুটাইয়া ধূলায় পথ মলিন করিয়া কে ছুটিয়া আসে? রাজা দেখিলেন— কাশ্মীর হইতে দূত আসিয়াছে। মুখে চোখে তার ভয়ের চিহ্ন আঁকা।

দূত কহিল—"রাজা, তোমার সোণার কেশবকে বাংলার সৈন্যদল যে চূর্ণ করিয়া ফেলিল, —শীঘ্র দেশে ছুটিয়া চল—আর কাশ্মীরের রক্ষা নাই। মুষ্টিমেয় গৌড় সৈন্য প্রতিশোধ লইবার জন্য কাশ্মীর আক্রমণ করিয়াছে।"

ললিতাদিত্যের মাথায় যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। মনে পড়িল আদিত্যবর্ম্মার মৃত্যুর কথা! বাংলার সৈন্য বুঝি তারই হত্যার প্রতিশোধ নিতে আসিয়াছে।

রাজা ললিতাদিত্য রন্নাদেবীর মুখের দিকে চাহিলেন—তখনো রাণীর মাথা তাঁর কোলের উপর রহিয়াছে। রাণীর মুখ পাংশু, যেন হাসি

লাগিয়া আছে ; কহিলেন—"দেবী, তুমি যেখানেই যাও, ললিতাদিত্যকে ক্ষমা করিও।"

রাজা আকাশের দিকে চাহিলেন।

তাঁর চোখের সম্মুখে সমস্ত অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিল।

বার

সেকালে ত' আর রেলগাড়ী ছিল না! বড় বড় দল বাঁধিয়া লোকেরা চলাফেরা করিত। তখনকার দিনে তীর্থে যাইতে হইলে, কিংবা ব্যবসা করিতে যাইতে হইলে লোকেরা দল বাঁধিয়া যাতায়াত করিত; কারণ পথে ঘাটে বিপদ আপদ ছিল অনেক।

জয়ন্তের শত সৈন্য নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া কাশ্মীরের দিকে হাঁটিয়া চলিল। কেহ সাজিল বণিক, কেহ সাজিল তীর্থযাত্রী; কেহ লইল

তম্বুরা, আর কেহ বা বীণ বাজাইয়া পথে পথে পয়সা রোজগার করিয়া চলিতে লাগিল। জয়ন্ত নিজে সাজিলেন বড় একজন শ্রেষ্ঠী। তরুণ এক সৈনিক জয়ন্তের কাছে আসিয়া কহিল, "সেনাপতি আমি তোমার তাম্বুলবাহী ভৃত্য হইয়া চলিব।" জয়ন্ত কহিলেন, "আমি ত' বাপু রাজা নই যে, আমার ভৃত্য লাগিবে, আমার নিজের কাজ আমি নিজেই করি।" যুবক ছাড়ে না—কহিল, "সেনাপতি, তোমার তাম্বুলবাহী ভৃত্যের দরকার নাই তাতে কি? আমি তোমার খাওয়ার তৈয়ারী করিয়া দিব, তোমার পিপাসার জল দিব—রৌদ্রে ছায়া করিয়া দিব—পথ হাটিতে কষ্ট হইলে তোমার সেবা করিব।" যুবকের এত আগ্রহ দেখিয়া জয়ন্ত রাজী হইলেন। তিনি সৈনিকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—একখানা বড় পরিচিত মুখ যেন তাঁর মনে পড়িয়া গেল।......

দিবারাত্র চলিয়া চলিয়া পায়ে ব্যথা ধরিয়া গেল। পায়ে ব্যথা ধরিলে গাছের তলায় সবাই

দাঁড়ায়—আবার পথ চলে। গৌড়ের সৈনিকগণ ক্ষুধা জানে না, তৃষ্ণা জানে না, কেমন করিয়া রাজ-হত্যার প্রতিশোধ লইবে তাহাতেই তাহারা মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। পথ দিয়া পথিক চলে। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলে,—"আমরা গৌড়ের বণিক, কাশ্মীরে ব্যবসা করিতে যাই।" কেহ উত্তর করে,—"কাশ্মীরের সরস্বতী দর্শন করিতে যাইতেছি।" কোন সৈনিক কহে,—"কাশ্মীরের পরিহাস কেশবের দুয়ারে আমি 'হত্যা' দিব,—আমার ছেলের অসুখ সারিবে।"

এমনি ভাবে মিথ্যা কথা কহিয়া, লোককে ভুলাইয়া জয়ন্ত পথ চলিতে লাগিলেন।...পথ আর ফুরায় না!......

তরুণ যুবক পিছনে পিছনে চলিয়াছে। জয়ন্ত ঘুমাইলে সে তালপত্রের পাখা দিয়া তাঁকে বাতাস করে,—নিজে তাঁর খাওয়ার তৈরী করে—তাঁর পিপাসায় জল দেয়, হাটিতে হাটিতে ক্লান্ত হইলে একমনে পদসেবা করে। জয়ন্তের এ

দিকে লক্ষ্য নাই—তিনি আপন মনে পথ চলিতেছেন।

ঐ দূরে মন্দিরের চূড়া দেখা যায়, চূড়ায় কাশ্মীরের নিশান উড়ে।—ঐ পরিহাসপুর বুঝি? কাশ্মীরের লোকেরা হাসিয়া কহে—"তোমরা বুঝি এ দেশের বাসিন্দা নও? পরিহাসপুর চেন না?" দূরে পরিহাসকেশবের মন্দির দেখিয়া আনন্দে জয়ন্তের বুক কাঁপিয়া উঠিল!

পাহাড়ের উপরে অমন সুন্দর আকাশ-ছোঁয়া মন্দিরটি; আশে পাশে আরও কত ছোট বড় মন্দির—তার সৌন্দর্য্যকে আরও মধুর করিয়া তুলিয়াছে। যখন জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া মন্দিরের গায়ে আছাড় খাইয়া পড়ে—যখন শ্বেত তুষার পড়িয়া মন্দিরের একুশ চূড়া আছন্ন হইয়া যায়, তখন মনে হয়, যেন দেবাদিদেব মহাদেব কাশ্মীরে আসিয়া ধ্যানে বসিয়াছেন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। মন্দিরে মন্দিরে কাঁসরঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। জয়ন্ত কহিলেন, "চল,

এইবার নগরে ঢুকিয়া পড়ি। সন্ধ্যার পরে সবাই মন্দিরের পিছনে একত্র হইবে।”

গৌড়-সৈন্যগণ একে একে অন্যের অলক্ষ্যে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া নগরে প্রবেশ করিল। প্রহরীরা কেহ সন্দেহ করিল না।

পরিহাসকেশবের মন্দিরের চারদিকে প্রকাণ্ড উঁচু প্রাচীর। প্রাচীরের মধ্যখানে বিরাট দেউড়ী। দেউড়ীর উপরে নহবৎখানা। নহবৎখানায় কাশ্মীরী বাজনা নানা সুরে বাজিতেছে। দেউড়ী পার হইলে আবার এক প্রাচীর। সেই প্রাচীর ছোট—দরজা পার হইলে প্রকাণ্ড উঠান। উঠানের এক দিকে সুন্দর ফোয়ারা—কত ফুল, কত গাছ, তাতে কত পাখী ডাকে, ফুলের গন্ধে স্থান আমোদ করে,—কৃত্রিম ঝরণায় জল চারিধারে ছড়াইয়া পড়ে। বাগানের অন্য দিকে মন্দির—আহা, মন্দিরের কি সুন্দর বাহার! চক্‌চক্‌ করিতেছে—মনে হয় যেন, এই মাত্র মন্দির গড়া শেষ হইয়াছে। কি ভীম কপাট!

আর মন্দিরের ভিতরে কেশবের স্বর্ণময় মধুর মূরতিখানি!

সন্ধ্যার আরতি বাজিয়া বাজিয়া থামিয়া গেল—ধূপ-ধূনায় ঘর অন্ধকার। মন্দিরের দেউড়ীতে প্রহরের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। গৌড়ের সৈন্যগণ ধীরে ধীরে মন্দিরের বাহিরে দেউড়ীর আশেপাশে আসিয়া জড় হইল। দুই একজন করিয়া ভিতরে যাইতে লাগিল, কহিল—"দেবতা দর্শন করিব।" প্রহরীরা কাহাকেও সন্দেহ করিল না। সবাই প্রায় চলিয়া আসিয়াছে, এমন সময় একজন সৈনিক হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেল। তার ছদ্মবেশের ভিতর হইতে শাণিত ছুরিকা হঠাৎ পড়িয়া গেল। সে সহসা ছুরিকা তুলিতে না তুলিতে একজন প্রহরী আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। চক্ষুর নিমেষে গৌড় সৈনিক বাম হস্তে কিরীচ বাহির করিয়া প্রহরীর বুকে বসাইয়া দিল। জয়ন্ত সকলের পিছনে ছিলেন, তিনি দেখিলেন,—আর বিলম্ব নয়। ক্ষুদ্র

এক ভেরী বাহির করিয়া তাহাতে ফুৎকার দিলেন। চক্ষের নিমেষে জয়ন্তের শরীর-রক্ষী সেই তরুণ সৈনিকের অস্ত্রের আঘাতে আর একজন প্রহরীর মুণ্ড মাটিতে লুটাইল! জয়ন্ত কহিলেন—"ধন্য! এই ত' চাই!"

ততক্ষণে সমস্ত গৌড়-সৈন্য ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিয়াছে। ছদ্মবেশ খুলিয়া সারিদিয়া দাঁড়াইয়া তাহারা মন্দিরের ভিতরে পা বাড়াইল। মন্দিরের রক্ষীগণ ব্যাপার দেখিয়া উচ্চশিখরে দাঁড়াইয়া ডঙ্কা বাজাইল। সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীর দল আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিল। মন্দিরে প্রহরী আর কয়টা থাকে! গৌড়-সৈন্য চক্ষের নিমেষে তাহাদের হত্যা করিয়া পথ পরিষ্কার করিল।

সকলে উচ্চকণ্ঠে কহিল—"জয়,গৌড়ের জয়!"

জয়ন্ত চলিলেন সকলের আগে। তার এক হাতে তরবারি আর এক হাতে গৌড়ের গরুড়-ধ্বজ; এদিকে মন্দিরের পুরোহিত ও পূজারিগণ বাহিরে আসিয়া দেখে—মন্দিরের দুয়ারে

রক্তারক্তি ব্যাপার সভয়ে মন্দিরের পুরোহিত পরিহাসকেশবের মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। জয়ন্ত দেখিলেন,—কেশবের মন্দিরের দক্ষিণ দিকে আর একটি মন্দির। এই মন্দিরকে পরিহাস-কেশবের মন্দির মনে করিয়া জয়ন্ত তাহার উপরে লাফাইয়া উঠিলেন। জয়ন্তের হস্তে ভীম কুঠার,—মন্দিরের মধ্যস্থিত রামস্বামীর রৌপ্যময় বিগ্রহের মাথায় জয়ন্ত ভীমবেগে আঘাত করিলেন। বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া চৌচার হইয়া পড়িয়া গেল। জয়ন্ত হুঙ্কার দিয়া কহিলেন—"গৌড়বাসী, এই দেখ রাজহত্যার প্রতিশোধ! ললিতাদিত্য, তোমার দর্প চূর্ণ হউক।"

বাঙ্গালী সৈন্যগণ আনন্দে মায়ের জয়গান গাহিল।

রামস্বামীর মন্দির হইতে জয়ন্ত গরুড়ধ্বজ হাতে করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া পরিহাস কেশবের মন্দিরে উঠিলেন। পুরোহিতেরা ততক্ষণে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে এমন সময় জয়ন্তের পিছন

হইতে কে কহিল—"জয়ন্ত, এই নাও লৌহ দণ্ড।" কথার স্বরে চমকিয়া জয়ন্ত দেখিলেন—সেই তরুণ! জয়ন্তের আর অবসর নাই, ভীম লৌহদণ্ড দিয়া দ্বারে আঘাত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গৌড়-সৈন্য বদ্ধ কপাটে আঘাত করিতে লাগিল, ঝম্ ঝম্ ঝম্—লৌহ কপাট আঘাতের পর আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িল!

জয়ন্ত অট্টহাসি হাসিলেন!

বাহিরে তূর্য্যধ্বনি হইল। জয়ন্তের পিছনে দাঁড়াইয়া সেই যুবক সেনানী কহিলেন—"সেনাপতি, সাবধান, দলে দলে সমুদ্রের স্রোতের মত কাশ্মীরী সৈন্য আসিতেছে।"

জয়ন্ত আবার চমকিয়া উঠিলেন,—এ কার কণ্ঠস্বর? এতো বড় পরিচিত, অতি পরিচিত! কত কালের কত কথা মনে পড়িয়া গেল। সেই ম্লান অন্ধকারে জয়ন্ত সৈনিকের মুখখানা আবার দেখিয়া লইলেন, শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন—"কে তুমি সৈনিক?"

সৈনিক উত্তর করিল না—জয়ন্তের হাত ধরিয়া মন্দিরের দিকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া কহিল, "পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নাও।"—আর শোনা গেল না, কাশ্মীরের সৈন্যদল পশ্চাৎ হইতে গৌড়-সৈন্যকে আক্রমণ করিল।

অগণিত সৈন্য—আর মুষ্টিমেয় গৌড়বাসী! আর কেহ হইলে নতজানু হইয়া প্রাণ ভিক্ষা চাহিত। আহত সর্পের মত গৌড়-সৈন্য ফিরিয়া দাঁড়াইল—দেখিল, কাতারে কাতারে কাশ্মীরের সৈন্যদল উন্মত্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে। তাদের রণ-কোলাহল সমুদ্রের গর্জ্জনের মত! গৌড়-সৈন্য-দল এক তিল নড়িল না—একটু কাঁপিল না। শুধু মুখে কহিল "জয়, বাংলার জয়।" তারপর ভীমবেগে সেই সৈন্য-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

জয়ন্ত পরিহাসকেশবের মন্দিরে ঢুকিলেন,—সহসা একজন কাশ্মীরী সৈন্য তরবারি দিয়া তাহাকে আঘাত করিল, জয়ন্তের দক্ষিণ হাত শুদ্ধ

কুঠার মাটিতে পড়িয়া গেল! জয়ন্ত ফিরিয়া দেখেন, কাশ্মীরী সৈন্যের মুণ্ড ধূলায় লুটাইতেছে— তরুণ সৈনিক তখনো তাঁর পিছনে! জয়ন্ত ফিরিলেন,—কহিলেন—"কে তুমি? কে তুমি সৈনিক বারংবার আমার জীবন রক্ষা করিতেছ?" সৈনিক হাসিল, কহিল, "কেশবের মূর্ত্তি এখনও চূর্ণ হয় নাই, সেনাপতি!"

জয়ন্তের মন কাঁপিয়া উঠিল। দক্ষিণ হস্ত কাটা গিয়াছে; অসীম ধৈর্য্যে জয়ন্ত বাম হস্তে পরিহাসকেশবের ভারী পাথরের মূর্ত্তিটি তুলিয়া ধরিলেন। হঠাৎ পিছনে শব্দ হইল। পিছন ফিরিয়া দেখেন,—তরুণ সৈনিক পড়িয়া গিয়াছে, বুকে তার বর্শা বিদ্ধ রহিয়াছে।......

জয়ন্ত চিনিলেন—এতক্ষণে চিনিলেন,— কহিলেন, "কল্যাণি? কল্যাণি, তুমি এখানে?"

কল্যাণী হাসিলেন,—কহিলেন "পিতার হত্যার প্রতিশোধ নাও—জয়ন্ত, আমায় ক্ষমা করো"। জয়ন্ত কহিলেন—"আমায় রক্ষা করতে

তুমি ছায়ার মত পিছনে পিছনে ঘুরেছ, আমি তা' এতটুকু জান্‌তে পারি নি !—হা অদৃষ্ট !"

জয়ন্তের ছিন্ন হাত হইতে রক্ত ঝরিতেছে। তার বাম হস্ত হইতে পরিহাসকেশবের স্বর্ণমূর্ত্তি খসিয়া পড়িল। ততক্ষণে কাশ্মীরী সৈন্যদল দলে দলে মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে। অসির আঘাতে জয়ন্তের প্রাণহীন দেহ কল্যাণীর পাশে পড়িয়া গেল,—জয়ন্তের মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—"মা, জন্মভূমি !"

একে একে এক শত গৌড়-সৈন্য হাজার হাজার কাশ্মীরী সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে দাঁড়াইয়া প্রাণ দিল, তবু প্রাণভয়ে একজনও পলাইল না। গৌড়-সৈন্যের তপ্ত রক্তে পরিহাস-কেশবের পবিত্র মন্দির সিক্ত হইয়া তীর্থস্থানে পরিণত হইল।

দূরে দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত কাশ্মীরবাসী তাহা চাহিয়া দেখিল।

তের

রাত্রি নামিয়া আসিল।

সুপ্ত চরাচর। ক্রমাগত দ্রুত ঘোড়া ছুটাইয়া ললিতাদিত্য রাজধানীতে পৌঁছিলেন। একি রাজধানী? না প্রেতপুরী? রাজধানীর সে আলোকমালা কোথায়? সৌন্দর্য্য তার কে হরণ করিল? নীরবে নতমস্তকে ধীরে ধীরে ললিতাদিত্য নগরে প্রবেশ করিলেন। নগর জনশূন্য,—কেহ রাজাকে অভ্যর্থনা করিল না—কেহ আসিয়া অভিবাদনও করিল না। শুধু রাজপথে রক্ত-পানে উন্মত্ত শৃগাল-কুক্কুরের বিকট চীৎকার ললিতাদিত্যের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিল:

সম্মুখে মশাল লইয়া প্রহরী চলিয়াছে,। চারিদিকে মৃতদেহ, শুধু স্তুপীকৃত মৃতদেহ; বাংলার শত সৈন্যের শোণিতধারা বুঝি তখনও উষ্ণ রহিয়াছে ! কেশবের মন্দির অন্ধকার। মশালের অল্প আলোতে তাহা বড় ভয়ানক দেখাইতে-ছিল। ললিতাদিত্য রামস্বামীর মন্দিরে যাইয়া দেখিলেন বিগ্রহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে ! তারপর তিনি পরিহাসকেশবের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দির যেন কাঁদিয়া উঠিল। ললিতাদিত্য দেখিলেন- শত গৌড়-সৈন্যের রক্তাক্ত মৃত দেহের মধ্যখানে পরিহাসকেশবের ভগ্ন রক্তাক্ত মূর্ত্তি পড়িয়া আছে।

ললিতাদিত্যের চোখ দিয়া এক ফোটা জল পড়িল না। অটল পাথরের মূর্ত্তির মত সেই মহাশশ্মানে ললিতাদিত্য কেশবের ভগ্নমূর্ত্তির পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন !

উপসংহার

কাশ্মীরের কবি কহ্লন শতবর্ষ পরে গাহিয়া গিয়াছেন—

অদ্যাপি দৃশ্যতে শূন্যং রামস্বামিপুরাস্পদম্ ;
ব্রহ্মাণ্ডং গৌড় বীরাণাং সনাথং যশসা পুনঃ ।

—রাজতরঙ্গিনী—
(৪।৩৩৫)

রামস্বামীর শূন্য মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজ পর্য্যন্ত ভূমণ্ডল মধ্যে গৌড়বাসীর বিপুল মহিমা প্রচার করিতেছে।

শেষ